নাট্যপ্রতিভা সিরিজ

তৃতীয় সংখ্যা।

অমরেন্দ্রনাথ।

সম্পাদক—

সিটি কলেজের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক

পণ্ডিত শ্রীউপেন্দ্রনাথ বিদ্যাভূষণ,

বি, এ (কলিকাতা), এম্, আর, এ, এস্ (লণ্ডন)।

১লা মাঘ, ১৩২৬।

শিশির পাব্লিশিং হাউস্,

কলেজ ষ্ট্রীট্ মার্কেট,

কলিকাতা।

মূল্য ১৲ টাকা মাত্র।

নিবেদন।

এই পুস্তক লিখিবার সময় পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন, এম, এ, বি, এল, পি, আর, এস্ মহাশয়ের সুযোগ্য মধ্যম পুত্র শ্রীমান্ হরীন্দ্রনাথ দত্তের নিকট হইতে অনেক বিষয়ে আমরা বিশেষ সাহায্য লাভ করিয়াছি। বিশেষতঃ হাপটোন চিত্রগুলির সমুদায় ব্লকই সেই সহৃদয় শ্রীমান্ এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত করিবার জন্য সানন্দে আমাদিগের হস্তে অর্পণ করিয়াছেন। তজ্জন্য আমরা তাঁহার নিকট সত্যই বিশেষ কৃতজ্ঞ।

বাল্যে অমরেন্দ্রনাথ।

অমরেন্দ্রনাথ।

প্রথম উল্লাস।

শৈশব ও কৈশোর।

আমরা অদ্য যাঁহার জীবনী লিখিতেছি, তাঁহার নামের সহিত বাঙ্গালার প্রায় প্রত্যেক লোকই পরিচিত। সময় সময় এমন এক একটী লোক জন্মগ্রহণ করেন যাঁহারা সৌভাগ্যবলে নিজেই তাঁহাদের কর্ম্মজীবনের সার্থকতা অনুভব করিয়া যাইতে সমর্থ হয়েন। অমরেন্দ্র-নাথও সেই শ্রেণীর একজন। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের ১লা এপ্রেল বাগবাজারে মাতুলালয়ে অমরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। জননীর জঠর হইতে যে দিন অমরেন্দ্রনাথ প্রথম ধরার আলো দেখিতে পান সে দিন কে ভাবিয়াছিল যে একদিন এই শিশুর নাম বঙ্গের গৃহে গৃহে ধ্বনিত হইবে। যিনি একদিনের জন্যও থিয়েটার দেখিয়াছেন, এমন কি যিনি শুধু থিয়েটারের নামটুকু মাত্র শুনিয়াছেন, তিনিও জানেন অমরেন্দ্রনাথ কে। বঙ্গ নাট্যশালার

জন্য অমরেন্দ্রনাথ যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহা নাট্যামোদী সুধীবৃন্দ জীবনে কখনও ভুলিতে পারিবেন না। ভবিষ্যতেও যাঁহারা বঙ্গ-রঙ্গশালার অতীত ইতিবৃত্তের পৃষ্ঠা কেবলমাত্র একবার উল্‌টাইবেন তাঁহারাও দেখিবেন তথায় অমরেন্দ্রনাথের নাম গগনপৃষ্ঠে উজ্জ্বল নক্ষত্রের ন্যায় অনশ্বর সুবর্ণাক্ষরে ক্ষোদিত হইয়া দিব্য প্রতিভালোকে পূর্ণপ্রদীপ্ত। ভগবানের করুণা ব্যতীত মানুষের কীর্ত্তি চিরদিনের মত বিশ্বের বুকের উপর অঙ্কিত হইয়া থাকে না। একথা কাহারও অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে অমরেন্দ্রনাথের উপর ভগবানের বিশেষ করুণা ছিল, তাই অমরেন্দ্রনাথের নাম বিশ্বের বুকের উপর এমন দৃঢ়ভাবে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। যতদিন বঙ্গ-নাট্যশালার অস্তিত্ব লুপ্ত না হইবে, যতদিন বঙ্গনাট্যশালাকে সহৃদয় সাহিত্যসেবিগণ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবেন, ততদিন অমরেন্দ্রনাথের নাম বঙ্গবাসী কখনও ভুলিবেন না!

মাতুলালয়ে অমরেন্দ্রনাথ যে দিন ভূমিষ্ঠ হন, সে দিন বাগবাজারের বোসেদের বাটীতে দীনবন্ধুবাবুর সধবার একাদশীর অভিনয় হইয়াছিল। গৃহে কেহই নিরানন্দ ছিলেন না। আমরা শ্রীযুক্ত নিখিলেন্দ্রকৃষ্ণ দেবের মুখে শুনিয়াছি, অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে তাঁহার বন্ধুদিগের নিকট প্রায়ই বলিতেন, 'বাড়ী শুদ্ধ সবাই সধবার একাদশীর অভিনয় দেখিবার জন্য ব্যস্ত, অথচ সেই সময়ে আমার মাতৃদেবীর প্রসব বেদনা উপস্থিত হয়। ঠিক যে সময়

অভিনয় আরম্ভ হয় সেই সময়ই আমার জন্ম হইয়াছিল।' অমরেন্দ্রনাথ প্রায়ই হাসিতে হাসিতে বলিতেন, 'আমার জন্ম থিয়েটার লগ্নে, আমি থিয়েটার করিব না তো থিয়েটার করিবে কে?'

গোলগাল ফুটফুটে ছেলেটীকে দেখিবামাত্রই মাতুলালয়ে সকলেই একবাক্যে বলিয়াছিলেন, "আহা! ছেলেটী যেন আকাশের পূর্ণচন্দ্র ধরায় অবতীর্ণ হইয়াছে।" সত্যই অমরেন্দ্রনাথ যে দিন ভূমিষ্ঠ হন সে দিন তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ হইতে যেন একটা মধুর লাবণ্যধারা 'ঠিক্‌রাইয়া' পড়িতেছিল।

অমরেন্দ্রনাথের পিতার নাম শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ দত্ত। দ্বারকা বাবু রেলির বাড়ীর মুচ্ছুদ্দী ছিলেন। তাঁহার চারি পুত্র। জ্যেষ্ঠের নাম ধীরেন্দ্রনাথ, মধ্যম হীরেন্দ্রনাথ, তৃতীয় অমরেন্দ্রনাথ, চতুর্থ বিজয়েন্দ্র-নাথ। অমরেন্দ্রনাথের বাল্য জীবন সম্বন্ধে আমাদের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। তিনি সে সম্বন্ধে নিজে যাহা লিখিয়া গিয়াছেন, আমরা তাহাই নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"আমার মনে পড়ে, আমাদের বাড়ীতে তখন প্রায়ই শকের যাত্রা হইত। আমি নিবিষ্ট মনে যাত্রা শুনিতাম। যাত্রার ভীম দুর্য্যোধন, দুঃশাসন প্রভৃতি মহারথিগণের অভিনয় ও অঙ্গ ভঙ্গী একাগ্র চিত্তে নিরীক্ষণ করিতাম। দেখিতে দেখিতে মনে ভাবিতাম কি সুন্দর! উপভোগ করিবার এমন মনোহর সামগ্রী বিশ্ব সংসারে আর কিছুই নাই! এইরূপ একদিনের কথা এখনও আমার বেশ মনে আছে।

সেদিন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের পালা হইতেছিল। আমি তখন আমার পিতার পার্শ্বে বসিয়া যাত্রা শুনিতেছিলাম। ক্রমে সেই দৃশ্য আসিয়া উপস্থিত হইল, যেখানে দুঃশাসন দ্রৌপদীর কেশা-কর্ষণপূর্ব্বক বস্ত্রহরণে প্রবৃত্ত। দুঃশাসন দ্রৌপদীর বস্ত্র আকর্ষণ করিতেছে, কিন্তু কেহই তাহাকে সাহায্য করিতে উঠিল না। আমি আর তাহা সহ্য করিতে পারিলাম না, তৎক্ষণাৎ উঠিয়া চীৎকার করিয়া পিতার উদ্দেশ্যে বলিলাম, 'বাবা, বাবা, ইহাকে রক্ষা করুন!'

এই দিনের যাত্রার অভিনয় আমার অন্তরের উপর রীতিমত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। যাত্রার নায়কদের অনুকরণে তীর ধনুক লইয়া যুদ্ধ করিবার বাসনা আমার অন্তরে প্রবল হইয়া উঠিয়া-ছিল। আমার মনে আছে পূজার ভাসানের দিন মার নিকট হইতে পয়সা চাহিয়া লইয়া আমার নিজের জন্য ও বাড়ীর অন্যান্য ছেলেদের জন্য বাঁকারির তীর ধনুক কিনিতাম; উহা হইতে একখানি নিজে লইতাম ও বাকিগুলি তাহাদের দিতাম। তারপর তাহাদের সকলকে লইয়া যাত্রার অনুকরণে ধনুক ধরিয়া যুদ্ধের অভিনয় করিতাম। এই প্রকার যুদ্ধ ক্রীড়ায় একদিন বড়ই প্রমাদ ঘটিয়া-ছিল। আমার ধনুকের তীর একটী বালকের চক্ষুর একটু উপরে ললাটে গিয়া বিঁধিয়াছিল, আহত স্থান হইতে দরদর ধারে রক্তস্রোত ছুটিয়াছিল, তাহার ফলে মা আমাকে এমন প্রহার দিয়াছিলেন যে, তাহার বেদনা আমাকে বহুদিন পর্য্যন্ত অনুভব করিতে হইয়াছিল।"

অমরেন্দ্রনাথ

বালক ভবিষ্যতে কি হইবে অতি শৈশব হইতেই তাহার সূচনা প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায়। বিলাতে এমন অনেক গল্প শুনিতে পাওয়া যায় যে যাঁহারা বড় বড় সেনাপতি হইয়াছেন তাঁহারা সকলেই বাল্যজীবনে যুদ্ধ ক্রীড়ার একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন। মহাবীর নেপলিয়ান সম্বন্ধেও এরূপ অনেক জনরব শুনিতে পাওয়া যায়। সে যাহা হউক, আমাদের মনে হয়, যাঁহার দেখিবার ক্ষমতা আছে তিনি যদি একটু বিশেষ ভাবে কোন শিশুর ক্রমশঃ বর্দ্ধমান জীবনী পর্য্যবেক্ষণ করেন তাহা হইলে তিনি সেই শিশু বড় হইলে কি হইবে অনায়াসেই ভবিষ্যৎ বাণী প্রদান করিতে পারেন। অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার বাল্যজীবনের যেটুকু আভাস দিয়াছেন সেইটুকু হইতেই আমরা তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের একটী পরিস্ফুট চিত্র অতি সহজেই অনুমান করিয়া লইতে পারি।

অমরেন্দ্রনাথ ক্রমে দিন দিন মাতা, পিতা ও আত্মীয় স্বজনের আদর যত্নে বড় হইয়া উঠিতে লাগিলেন। যথা সময়ে তাঁহার হাতে-খড়ি হইল। তখন তিনি তাঁহাদের আদি বাড়ী চোরবাগানে ছিলেন। আমরা বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি চোরবাগানের সুবিখ্যাত দত্ত-বংশে অমরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়। তাঁহার পিতা দ্বারকা বাবু রেলির বাড়ীর মুচ্ছুদী হইয়া বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন। চোরবাগানের পুরাতন বাটীতে পুত্র কন্যা লইয়া থাকিতে নানারূপ অসুবিধা হওয়ায় তিনি হাতীবাগানে জমী ক্রয় করিয়া নূতন বাটী নির্ম্মাণ

করিয়াছিলেন ও তৎপরে সপরিবারে আসিয়া হাতীবাগানের এই নূতন বাটীতে বসবাস করেন। অমরেন্দ্রনাথের হাতে খড়ি হইবার কিছু দিন পরেই দ্বারকানাথ বাবু নূতন বাটীতে চলিয়া আসেন। এই বাটীর পশ্চাৎভাগে একটি ক্ষুদ্র গলির ভিতর তখন কটন ইন্‌ষ্টিটিউসন ছিল। অমরেন্দ্রনাথ নিতান্ত শিশু বলিয়াই দ্বারকা বাবু এই স্কুলে সর্ব্বপ্রথম অমরেন্দ্রনাথকে ভর্ত্তি করিয়া দেন। কিন্তু স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিলে কি হইবে, স্কুল-পাঠ্য কোন পুস্তকেই তাঁহার মন বসিত না। একটু সুযোগ পাইলেই তিনি তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গ ডাকিয়া লইয়া নানারূপ যাত্রার অভিনয় করিতেন। এই সম্বন্ধে স্বয়ং অমরেন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

"* * * ক্রমে পড়া শুনার বয়স আসিল,—স্কুলে ভর্ত্তি হইলাম। পড়া শুনা চলিতে লাগিল। আমার আগ্রহ কিন্তু ঐ সকল নাটকীয় খেলা ধূলার দিকে। সেই যাত্রার ভীম ও দুর্য্যোধনের অনুকরণে বীররসাত্মক আস্ফালন আমার বাল্য জীবনের খেলাধূলার অকৃত্রিম নিদর্শন। অন্য কোন প্রকার খেলার দিকে আমার আদৌ আগ্রহ ছিল না। অবসর কালে স্কুলের পাঠ্য পুস্তকের পড়া শুনার দিকে মন যাইত না। কিন্তু যদি নাটক পাইতাম, আগ্রহ সহকারে তাহা পাঠ করিতাম এবং পাছে কেহ তাহা জানিতে পারিয়া তিরস্কার করে এই আশঙ্কায় ত্রিতলের ছাদের উপর গিয়া গোপনে তাহা পাঠ

করিতাম। জলপানির পয়সা বাঁচাইয়া কেবল নাটক কিনিতাম ও এই ভাবে তাহা পাঠ করিতাম।

ইহার পর হাতীবাগানে আমাদের নূতন বাটী নির্ম্মিত হইল। আমরা নূতন বাটীতে আসিলাম। বাটীর অনতিদূরে ষ্টার থিয়েটারের নূতন বাটী তখন প্রস্তুত হইতেছিল। স্কুলের ছুটী হইলে বাটী আসিয়া কাপড় চোপড় ছাড়িয়াই আমি গোপনে এই বাটীর নিকটে আসিয়া দাঁড়াইতাম। প্রগাঢ় আগ্রহ সহকারে উক্ত থিয়েটার বাটী দেখিতাম—দেখিতে দেখিতে তন্ময় হইয়া যাইতাম,—কত কি ভাবিতাম। তখন আমার মনে হইত এই বাটীর সহিত যেন আমার জন্ম-জন্মান্তরের—যুগ-যুগান্তরের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ বিদ্যমান। যখনই আমি ফাঁক পাইতাম, তখনই এই বাটীর নিকট পলাইয়া আসিতাম ও কত কি ভাবিতাম।

ইহার অল্প দিন পরেই আমাদের চোরবাগানের বাটীতে একটী উৎসব উপলক্ষে "বেঙ্গল থিয়েটার" অভিনয়ার্থ আহূত হয়। আমরা সকলেই সেখানে গিয়াছিলাম। অভিনয়ের পালা ছিল—"দুর্ব্বাসার পারণ" ও "স্বাধীন জেনানা"। ইহার পূর্ব্বে আমি কখনও থিয়েটার দেখি নাই। মনে আছে যোগীন্দ্রচন্দ্র ঘটক ভীম, মথুরচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বিদূষক, গণেশচন্দ্র ঘোষ দুর্য্যোধন, গিরিশচন্দ্র ঘোষ (নেদারু গিরিশ) শকুনি, বর্ত্তমান বঙ্গরঙ্গমঞ্চের সুবিখ্যাত অভিনেত্রী শ্রীমতী কুসুমকুমারীর মাতা সাজিয়াছিলেন—দ্রৌপদী,

কালীকিঙ্কর মল্লিক—যুধিষ্ঠির ও চিত্ররথ, বেঙ্গল থিয়েটারের লেখক ও বিজ্ঞাপন বিভাগের অধ্যক্ষ কুঞ্জবিহারী বসু দুর্ব্বাসার শিষ্য সাজিয়াছিলেন। শিষ্যরূপী কুঞ্জবিহারীর রসিকতা এখনও আমার স্মরণ আছে। একটী দৃশ্যে শিষ্য দুইটী বাহির হইলেন,—প্রথম শিষ্যটী বলিলেন, "ঠাকুরটীর সবই উল্টো।"

দ্বিতীয় শিষ্য (কুঞ্জবাবু) উত্তর দিলেন, "পা'টা শুদ্ধ।"

সেই আমার প্রথম থিয়েটার দর্শন। সে অভিনয় আমার কত মনোরম লাগিয়াছিল!—যেন এখনও আমার চক্ষুর উপর বিরাজমান রহিয়াছে। যে সকল অভিনেতৃদের নাম করিলাম, ইহাঁরা সকলেই তখনকার সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতা ও অভিনেত্রী।

"দুর্ব্বাসার পারণ" অভিনয় দেখিবার পর হইতেই, উক্ত নাটকখানি পড়িবার ইচ্ছা আমার অন্তরে অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠিল। আমার বয়স তখন ১৩ বৎসরের মধ্যে। আমি তখন মেট্রোপলিটন ইন্‌ষ্টিটিউসনে পড়িতেছিলাম। একদিন স্কুল হইতে ফিরিবার সময় গাড়ী থামাইয়া গুরুদাস বাবুর দোকানের ভিতর ঢুকিয়া উক্ত নাটকখানির কত মূল্য তাহা জিজ্ঞাসা করিলাম। শুনিলাম উক্ত পুস্তকখানা স্বতন্ত্র পাওয়া যায় না। উহা রাজকৃষ্ণ বাবুর গ্রন্থাবলীর অন্তর্গত। যে খণ্ডে ঐ গ্রন্থখানি আছে সেই খণ্ডের মূল্য দুই টাকা। সেই সময় দুইটী টাকা একত্রে সংগ্রহ করা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না, কারণ আমাদের হাতে যাহাতে পয়সা

কড়ি না পড়ে সেদিকে পিতার ও মেজদাদার (শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত) প্রখর দৃষ্টি ছিল এবং মেজদাদার শাসনও অত্যন্ত কঠোর ছিল। দৈনিক চারিটী পয়সা করিয়া আমার হাত খরচের জন্য বরাদ্দ ছিল। তাহাতে চানাচুরই খাও আর জীবে গজাই খাও, কারণ এই দুইটী জিনিষ সে সময় আমার অত্যন্ত মুখরোচক ছিল।

দুই টাকার কমে পুস্তক পাইবার কোনও সম্ভাবনা নাই বুঝিয়া বড়ই বিষণ্ণ মনে বাড়ী ফিরিয়া আসিলাম। কেমন করিয়া দুইটী টাকা সংগ্রহ করিব—সেই চিন্তায় অধীর হইলাম। বহুক্ষণ চিন্তার পর একটী উপায়ও স্থির হইল। আমার মাতাঠাকুরাণীর বিছানার নীচে টাকা কড়ি গুজিয়া রাখা অভ্যাস ছিল। বাজার করিয়া বা নোট ভাঙ্গাইয়া ভৃত্যেরা যে টাকা তাঁহার হাতে ফেরত দিত, তিনি অমনি তাহা বাক্স পেঁটরায় না রাখিয়া বিছানায় তোষকের নীচে গুঁজিয়া রাখিয়া দিতেন। আমি তাহা জানিতাম, সময়ে সময়ে লক্ষ্যও করিতাম। চিন্তার ফলে এই উপায়টী এক্ষণে আমার মনে উদিত হইল। আমি তৎক্ষণাৎ মাতার বিছানা অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম। অল্প ক্ষণের মধ্যেই বিছানার তলদেশ হইতে পাঁচটী টাকা খুঁজিয়া পাইলাম। আমি সেই টাকা হইতে দুইটী টাকা লইয়া অতি সন্তর্পণে বাহিরে চলিয়া আসিলাম। পরদিন স্কুলের ছুটীর পর গুরুদাস বাবুর দোকান হইতে দুই টাকা দিয়া একখানা "দুর্ব্বাসার পারণ" ক্রয় করিয়া মহোল্লাসে বাড়ী ফিরিয়া

আসিলাম। সেই দিনই পুস্তকখানা পাঠ করিয়া তবে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম।”

যাঁহার বাল্য কাল হইতেই নাটক পড়িবার এরূপ ঝোঁক ধরে তাহার লেখা পড়া অর্থাৎ স্কুল পাঠ্য পুস্তক পাঠ যে কতদূর হয় সে কথা লেখাই বাহুল্য। অমরেন্দ্রনাথের অতি বাল্যকাল হইতেই নাটক পড়িবার একরোকা এমনই ঝোঁক আসিয়াছিল যে তাঁহার লেখা পড়ায় নিতান্তই অবহেলা হইতে লাগিল। তাঁহার লেখা পড়ার এই অবহেলা ক্রমেই তাঁহার আত্মীয় স্বজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে লাগিল। অমরেন্দ্রনাথের মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত বাবু হীরেন্দ্রনাথ দত্ত একদিন ভাইকে বেশ করিয়া ‘রুলের’ আঘাতে লেখা পড়ায় চাড় হইবার জন্য রীতিমত শাসন করিলেন, কিন্তু ‘চোরা না শোনে ধর্ম্মের কাহিনী’। মধ্যম ভ্রাতার কঠোর শাসন সত্ত্বেও অমরেন্দ্রনাথের স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইল না, তিনি পূর্ব্বে যেমন দিবা রাত্র নাটক পাঠ করিতেন, তাঁহার নাটক পাঠ সেইরূপই চলিতে লাগিল। হীরেন্দ্র বাবু ভ্রাতার অবস্থা দেখিয়া বেশ একটু চঞ্চল হইয়া উঠিলেন। তিনি একদিন অমরেন্দ্রনাথের সেই সকল শোণিত-তুল্য প্রিয় গ্রন্থগুলি (অর্থাৎ এ যাবৎ অমরেন্দ্রনাথ হাত খরচের চারিটী পয়সা বাঁচাইয়া যে কয়খানি নাটক কিনিয়াছিলেন সেগুলি) একস্থানে জড় করিয়া অগ্নি-সংযোগে ভস্মীভূত করিয়া দিলেন। এই ঘটনায় অমরেন্দ্রনাথ বড়ই মর্ম্মাহত হইলেন,—এত দুঃখ তিনি

জীবনে আর কখনও অনুভব করেন নাই। তাঁহার মেজদাদা সেদিন যে তাঁহাকে স্কুলের বাড়ীতে নির্দ্দয়ভাবে প্রহার করিয়াছিলেন তাহাতে তাঁহার তত কষ্ট হয় নাই, যত কষ্ট হইল তাহার এতদিনের সঞ্চিত প্রিয় পুস্তকগুলি অগ্নিসাৎ করিয়া দেওয়ায়। তাঁহার সেই সাধের পুস্তকগুলি যেদিন বাটীর উঠানের মাঝখানে ভস্মীভূত হইয়া গেল সেদিন তিনি সারাদিন অনাহারে থাকিয়া কেবলই কাঁদিয়াছিলেন।

এই ঘটনার কিছুদিন পরে মহাসমারোহে নূতন বাড়ীতে ষ্টার থিয়েটার খুলিবার বিজ্ঞাপনের ছড়াছড়ি পড়িয়া গেল। যেদিন থিয়েটার খোলা হইল সেইদিন অমরেন্দ্রনাথের বাটীর অনেকেই থিয়েটার দেখিতে যাইবেন স্থির করিলেন, অমরেন্দ্রনাথও তাঁহাদের সহিত থিয়েটারে যাইবার জন্য আবদার ধরিলেন। কিন্তু তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা হীরেন্দ্রবাবু কিছুতেই তাঁহাকে থিয়েটারে পাঠাইতে সম্মত হইলেন না। অমরেন্দ্রনাথ কান্নাকাটি জুড়িয়া দিলেন, শেষে তাহার পিতা তাহাকে যাইতে অনুমতি দিলেন। পিতার নিকট থিয়েটার দেখিতে যাইবার অনুমতি পাইয়া সেদিন অমরেন্দ্রনাথের প্রাণের ভিতর যে আনন্দের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গিয়াছিল সে কথা লিখিয়া শেষ করা যায় না। তিনি তখনি সাজিয়া গুজিয়া হাসি-মুখে থিয়েটার দেখিতে রওনা হইলেন। এই ঘটনা সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়া গিয়াছেন তাহা আমরা এখানে উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন কিছুতেই পরিত্যাগ করিতে পারিলাম না। তিনি লিখিয়াছেন,—

অমরেন্দ্রনাথ

"ইহার কিছুদিন পরে ষ্টার থিয়েটার খোলা হইল। প্রথম রজনীতে গিরিশচন্দ্রের নসীরামের অভিনয়। বাটীর নিকটেই নূতন থিয়েটার নূতন উৎসবে খোলা হইবে, সুতরাং আমাদের বাড়ীর অনেকেই সেদিন থিয়েটার দেখিবার জন্য উৎসাহান্বিত। আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর বক্স রিজার্ভ করিতে পাঠাইলেন। আনন্দ ও উৎসাহে আমার অন্তর নাচিয়া উঠিল। আমি আমার পিতার 'আবদারে ছেলে' ছিলাম, তিনি আমাকে অত্যন্ত ভালবাসিতেন। আমি তাঁহাকে গিয়া ধরিয়া বসিলাম, বলিলাম,—'মেজদাদাকে বলিয়া দিন আমি আজিকার মত থিয়েটার দেখিতে যাইব।'

পিতাঠাকুরের নিকট একবার দরবার করিলাম, তাহার পর মাতাঠাকুরাণীর নিকট গিয়া তাঁহাকেও ধরিলাম। মেজদাদা ত কিছুতেই সম্মত নন্—আমি থিয়েটার দেখিতে যাই, ইহা তাঁহার আদৌ ইচ্ছা নয়। অনেক কান্নাকাটি সুপারিস ইত্যাদির পর তিনি অনুমতি দিলেন।

সেদিন শুক্রবার, মনে আছে সেদিন ফুলদোল। হাতীবাগানের বাড়ীতে ষ্টারের প্রথম অভিনয় রজনী। আমরা অভিনয় দেখিতে থিয়েটারে প্রবেশ করিলাম। রঙ্গালয়ের সাজসজ্জা ইন্দ্রালয় তুল্য। নয়ন-মন-বিভ্রমকারী সুরম্য ভবন, অসংখ্য অসংখ্য উজ্জ্বল আলোকমালা ও সুপরিচ্ছদধারী নানাশ্রেণীর সহস্র সহস্র শ্রোতার সমাগম প্রভৃতি দেখিয়া আমি বিস্ময় ও আনন্দে অভিভূত হইলাম। ভাবিলাম

আমি কোথায় আসিয়াছি ! এত শোভা, এত সৌন্দর্য্য, নয়নাভিরাম এমন উজ্জ্বল দৃশ্য—এই প্রথম আমার চক্ষুর উপর উদ্‌ভাসিত হইল। ভাবিলাম যবনিকার বাহিরে রঙ্গপীঠেই যখন এত মাধুরী, না জানি যবনিকার অভ্যন্তরে—রঙ্গমঞ্চে আরোও কত অপার্থিব দৃশ্যলহরী প্রচ্ছন্ন আছে।”

আমার মনে আছে এই দিন অভিনয় আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে স্বনামখ্যাত নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয় ষ্টেজের উপর দর্শন দিলেন। একটী শাদা পাঞ্জাবী তাঁহার গায় ছিল। সহস্র সহস্র দর্শকের কৌতূহলোদ্দীপক লোচন তাঁহার উপর নিপতিত হইল। অমৃত বাবু একটী কবিতা আবৃত্তি করিলেন। এই কবিতাটি মুদ্রিত হইয়া সমাগত দর্শকগণের মধ্যেও বিতরিত হইয়াছিল। যদিও এখন তাহার অস্তিত্ব নাই, কিন্তু প্রথম কয়েকটী ছত্র আমার বেশ স্মরণ আছে। কবিতাটী বড়ই হৃদয়গ্রাহী হইয়াছিল। উক্ত কবিতাটী এখন আর পাইবার সম্ভাবনা নাই, সুতরাং এমন সুন্দর কবিতার যতটুকু অংশ সংরক্ষিত করা যায় তাহাই লাভ বলিয়া মনে করি। যে কয় ছত্র আমার স্মরণ আছে তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।

হে সজ্জন ! পদে নিবেদন,
নির্ব্বাসিত মনোদুঃখে,
বঞ্চিলাম অতি সুখে,
বঞ্চিত বাঞ্ছিত তব যুগল চরণ ;

যুগ সম বর্ষের ভ্রমণ,
আজি পুনঃ পূর্ণ আকিঞ্চন।

ইহার পরবর্ত্তী ছত্রগুলি আর আমার মনে নাই। অতঃপর অভিনয় আরম্ভ হইল। এক বটবৃক্ষমূলে—নানা রঙ্‌এর পোষাক পরিয়া কুর্দ্দো কুর্দ্দো মর্দ্দ মত—তাড়ীর ঝাঁরা লইয়া

রূপিয়া লুকিয়ে রেখছ কোথা পা' ;
তুমি অমন করে শুঁড়ীর ঘরে
পায় ধরি আর যেও না।

বলিয়া বিকট স্বরে গান ধরিল। শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু—নসীরাম, শ্রীযুক্ত অমৃতলাল মিত্র—অনাথনাথ, ৺অঘোরনাথ পাঠক—কাপালিক, ৺অমৃতলাল মুখোপাধ্যায় (বেল বাবু)—শম্ভু, ৺প্রবোধচন্দ্র ঘোষ—ভূতনাথ, উপেন্দ্রনাথ মিত্র—রাজা, ৺মহেন্দ্রনাথ চৌধুরী মন্ত্রী এবং অভিনেত্রীদিগের মধ্যে ৺গঙ্গামণি—সোনা, ৺কাদম্বিনী—বিরজা, এবং ৺হরিমতি—মাধুরীর (এই অভিনেত্রী জীবিতা থাকিলে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে সুগায়িকা বলিয়া পরিচিতা হইতেন) ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

নসীরাম নাটকখানি স্বর্গীয় গিরিশচন্দ্র ঘোষের লেখা বটে, কিন্তু সে সময় তিনি ৺গোপাললাল শীলের "এমারেল্ড" থিয়েটারের ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত ছিলেন, সুতরাং অন্য রঙ্গালয়ে প্রকাশ্যভাবে কোন বই দেওয়া তাঁহার সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু শিষ্য ও সুহৃদ্‌বর্গের প্রতি স্নেহাধিক্য বশতঃ গিরিশচন্দ্র খালধারে খোলার ঘর ভাড়া

করিয়া লালপেড়ে শাড়ি পরিয়া অতি গোপনে এই নাটকখানি লিখিয়া দিয়াছিলেন। পাছে গোপাললাল শীল জানিতে পারেন এই আশঙ্কায় তিনি স্ত্রীলোক সাজিয়া গভীর রাত্রে এই বই লিখিতেন। প্রকাশ্য রঙ্গালয়ে আসিয়া এই আমার প্রথম থিয়েটার দর্শন।”

এই সময় অমরেন্দ্রনাথের বয়স সবে মাত্র তের পার হইয়াছে। তিনি অভিনয় দর্শনের পর গৃহে প্রত্যাগত হইলেন, কিন্তু সেই দর্শন অবধি কেমন যেন একটা থিয়েটারের মদিরায় তিনি একেবারে বিভোর হইয়া পড়িলেন। যাত্রা দেখিবার পর হইতেই একজন অভিনেতা হইবার মতি তাঁহার প্রাণের ভিতর ধীরে ধীরে জাগিয়া উঠিতেছিল। আবার ষ্টার থিয়েটার দেখিয়া আসিবার পর হইতে সেই ইচ্ছাটা কর্ম্মকরী করিবার জন্য তিনি একেবারে ব্যাকুল হইয়া পড়িলেন। মাত্র ত্রয়োদশ বৎসরের একটী বালকের যদি একজন অভিনেতা হইবার এইরূপ প্রকট ইচ্ছা প্রাণের ভিতর বলবতী হইয়া উঠে তাহা হইলে তাহার পক্ষে লেখা পড়া হওয়া কতদূর সম্ভব তাহা সকলেই অনুমান করিতে পারেন। অমরেন্দ্রনাথেরও স্কুল যাওয়া একরূপ বন্ধ হইল। কেমন করিয়া অভিনেতা হইতে পারিবেন তখন তাহাই হইল তাঁহার জপতপ। অমরেন্দ্রনাথের জন্ম অতি উচ্চ বংশে, তার পর তিনি ধনবানের সন্তান, কাজেই স্কুল হইতেই তাঁহার দুই চারিজন মোসাহেব জুটিয়াছিল। অমরেন্দ্রনাথ তাঁহাদের প্রাণের বন্ধু ভাবিতেন। ক্রমশঃ তাঁহার মনের এই অদমনীয় ইচ্ছার কথা তিনি তাঁহাদের নিকট জ্ঞাপন

করিলেন। তিনি একদিন তাঁহাদের মধ্যে একজনকে নির্জ্জনে পাইয়া কহিলেন, "ভাই, আমি সে দিন ষ্টার থিয়েটার দেখিতে গিয়াছিলাম। যাহা দেখিলাম তাহা মুখে বলিবার নয়। আমার এক্টার হইবার ভারি ইচ্ছা। বলিতে পার কি করিলে এ্যাক্টার হওয়া যায়?"

বন্ধু আস্ফালন করিয়া উত্তর দিলেন, "এ আর এমন একটা শক্ত কি কাজ! একটা থিয়েটার খোল, তাহা হইলেই এ্যাক্টার হইতে পারিবে।"

থিয়েটার খোল কথাটা বলা যত সহজ, উহা কাজে পরিণত করা ততোধিক কঠিন। বন্ধু নির্ব্বিকারচিত্তে তো বলিয়া দিলেন থিয়েটার খোল, কিন্তু কথাটা অমরেন্দ্রনাথের প্রহেলিকার মত ঠেকিল। এ্যাক্টার হইতে হইলে যে একটা থিয়েটার খুলিতে হয় এ কথাটা এতদিন তাঁহার মনে আদৌ উদিত হয় নাই। বন্ধুর মুখে কথাটা শুনিয়া তিনি একেবারে 'মুষড়াইয়া' পড়িলেন। থিয়েটার কেমন করিয়া খুলিতে হয়, থিয়েটার খুলিতে কি কি প্রয়োজন, তিনি তাহার কিছুই জানিতেন না! তবে এইটুকু বেশ বুঝিলেন থিয়েটার খুলিতে হইলে এক রাশি টাকার প্রয়োজন। যদিও তিনি ধনীর পুত্র, কিন্তু তখনও তাঁহার পিতা জীবিত, সুতরাং অজস্র টাকা আসিবে কোথা হইতে!"
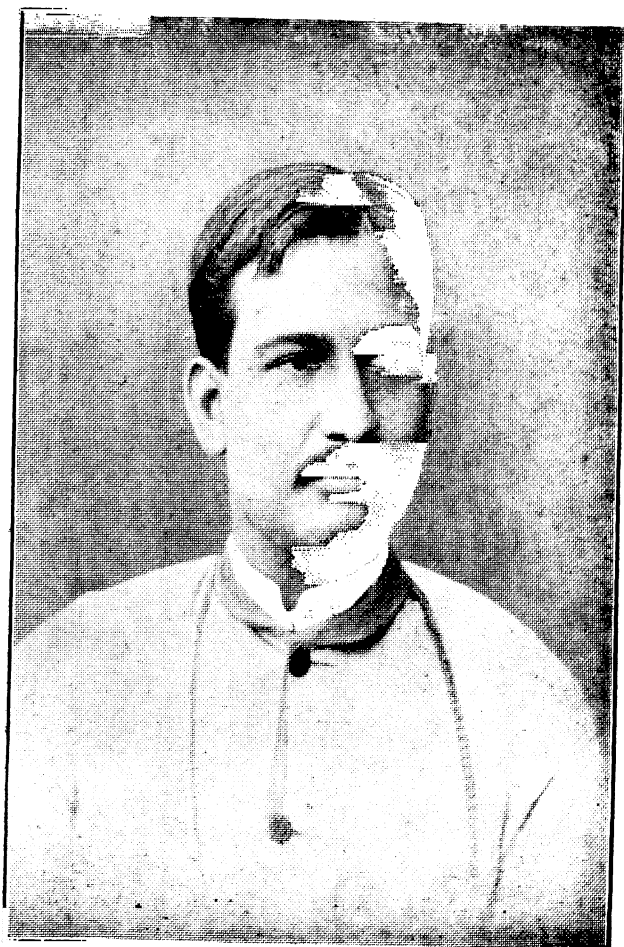
যৌবনের প্রারম্ভে অমরেন্দ্রনাথ।

দ্বিতীয় উল্লাস।

প্রমাদে পতঙ্গ-বৃত্তি।

বাড়ীতে আত্মীয় স্বজনের শত সহস্র তাড়না। কিন্তু কিছুতেই অমরেন্দ্রনাথের দৃক্‌পাত নাই। তাঁহার কেবল একই ধ্যান, একই জ্ঞান—কেমন করিয়া অভিনেতা হইব। অমরেন্দ্রনাথের মধ্যম ভ্রাতা শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত যখন শেষ বুঝিলেন ভ্রাতার লেখাপড়া হওয়া অসম্ভব, তখন তিনি তাঁহাকে পিতার সহিত আফিসে বাহির করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ দুই চারি দিন পিতার সহিত আফিসে বাহির হইয়া, আবার আফিসে যাওয়া বন্ধ করিলেন। হীরেন্দ্র বাবু তাঁহাকে আফিসে যাইবার জন্য রীতিমত তাড়া হুড়া আরম্ভ করিলেন, কিন্তু সে তাড়নায় কোনই ফল ফলিল না। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার পিতা মাতার 'আদরের গোপাল' ছিলেন। মাতা পিতার স্নেহাধিক্য বশতই হীরেন্দ্রবাবুর কোন তাড়নাই ফলপ্রদ হইত না। আফিসে নিয়মিত বাহির হইবার জন্য হীরেন্দ্র বাবুকে তাড়াহুড়া করিতে দেখিয়া তাঁহার পিতা একদিন তাঁহাকে ডাকিয়া অমরেন্দ্রনাথকে যখন তখন তিরস্কার করিতে নিষেধ করিয়া দিলেন। পিতার এই কথায় হীরেন্দ্রনাথ কি বুঝিয়াছিলেন

অন্তর্যামীই জানেন, কিন্তু তাহার পর হইতে তিনি আর কোন দিন তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা অমরেন্দ্রনাথকে কোনরূপ তিরস্কার করেন নাই।

পিতা মাতার 'নন্দদুলাল' বলিয়া বাটীর কেহই অমরেন্দ্রনাথকে কোন কথা বলিতেন না। তাঁহার এক মাত্র শাসনকর্ত্তা ছিলেন মধ্যম ভ্রাতা, তিনিও যখন নীরব হইলেন তখন আর তাঁহাকে পায় কে? অমরেন্দ্রনাথ লেখাপড়া ছাড়িয়া এখন হইতে কেবল তাঁহার বদ্-সঙ্গীদের সহিত মিলিত হইয়া হৈ হৈ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। তখন তাঁহার একমাত্র কার্য্যই হইয়াছিল তাঁহার সেই দলটী লইয়া দিন রাত কেবল একই চিন্তা—কেমন করিয়া থিয়েটার খোলা যাইতে পারে? তাঁহার দলটী যা জুটিয়াছিল তাহাদের ভিতর একটীও ভাল ছেলে ছিল না। কেমন করিয়া থাকিবে! যে সকল বালকদের একমাত্র চিন্তা কেমন করিয়া থিয়েটার খুলিব তাহাদের ভিতর কি ভাল ছেলে থাকিতে পারে? অমরেন্দ্রনাথ যে দিন দিন নিম্ন হইতে অতি নিম্নস্তরে নামিয়া যাইতেছেন, ক্রমশঃ আত্মীয় স্বজনের দৃষ্টি সে দিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইতে লাগিল। তাঁহার আত্মীয় স্বজনের তখন একমাত্র চিন্তা হইল,—কি উপায় করিলে এই বালকের স্বভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায়? নানা জনে নানা পরামর্শ দিল। শেষে স্থির হইল, ছেলের বিবাহ দিয়া একটি লাল টুক্‌টুকে বৌ আনিলেই ছেলের স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইবে। যেমন পরামর্শ স্থির অমনি কার্য্য আরম্ভ হইয়া গেল। পিতা যদি ধনবান্ হন তাহা হইলে তাঁহার পুত্রের

বিবাহ হইতে বিলম্ব হয় না। চারিদিকে ঘটক ঘটকীর ছুটছুটি পড়িয়া গেল। নানা দিক হইতে সম্বন্ধ আসিতে আরম্ভ হইল। শেষে কয়েকটী পাত্রী দেখিবার পর একটী পাত্রী পছন্দ হইল এবং মহাসমারোহে যথা সময়ে অমরেন্দ্রনাথের বিবাহ হইয়া গেল। তখন অমরেন্দ্রনাথের বয়স অনুমান পঞ্চদশ বৎসর। অমরেন্দ্রনাথের আত্মীয় স্বজনগণ ভাবিয়াছিলেন উদ্বাহবন্ধনে অমরেন্দ্রনাথের স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইবে। কিন্তু বিবাহের পরও তাঁহার স্বভাবের কোনই পরিবর্ত্তন লক্ষিত হইল না। তিনি পূর্ব্বেও যেমন ছিলেন এখনও সেইরূপই রহিলেন। মাঝখান হইতে বেশ একটু বাবু হইয়া পড়িলেন। বিবাহের পর হইতেই তাঁহার হাতও একটু স্বচ্ছল হইল। পূর্ব্বে তাঁহার হাতে একটি পয়সাও পড়িত না, এক্ষণে মাসে মাসেই 'থক্‌থাক্' কিছু কিছু তাঁহার হাতে আসিয়া পড়িতে লাগিল। সেই টাকায় অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার দলবল লইয়া প্রায়ই ষ্টার থিয়েটার দেখিতে লাগিলেন। এদিকে যতই থিয়েটার দেখা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল ততই তাঁহার মন থিয়েটারের ভিতর ডুবিয়া যাইতে লাগিল। থিয়েটারের ভিতরের ব্যাপারটা কি, তাহা জানিবার জন্য একটা অতৃপ্ত কৌতূহল তাঁহার সমস্ত প্রাণটাকে ক্রমাগত দুলাইতে লাগিল। উপাসকের নিকটে উপাসনা-মন্দিরের ন্যায় থিয়েটার তাঁহার কাছে একটী পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তির সামগ্রী ছিল। থিয়েটার সংশ্লিষ্ট-অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ তাঁহার চক্ষে নিতান্ত আদর ও সম্মাননার পাত্র ছিলেন। তিনি প্রায়ই

তাঁহার সাঙ্গোপাঙ্গদিগকে বলিতেন, "ভাই, এই যাঁহারা থিয়েটারে অভিনয় করেন তাঁহাদের কি সৌভাগ্য! আমার উঁহাদের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য বড় ইচ্ছা হয়।"

দলের মধ্যে একজন বেশ একটু মাতব্বর গোছের ছোক্‌রা ছিলেন। তিনি তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "এ আর এমন একটা কি শক্ত কথা! তুমি কিছু টাকা জোগাড় কর, তারপর আমায় বলিও কোন অভিনেত্রীর সঙ্গে আলাপ করিবে। তুমি যাঁহার সঙ্গে আলাপ করিতে চাও, আমি তাঁহার সঙ্গেই তোমার আলাপ করাইয়া দিব। তবে ভাই এ্যাক্টারদের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দেওয়া আমার ক্ষমতার বাহিরে। তাঁহাদের চালচলন যা' দেখি তা'তে মনে হয় তাঁহারা যেন মস্ত এক একটা লাট সাহেব।"

অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার সেই বন্ধুর কথা মহা আগ্রহভরে শুনিতে-ছিলেন। বন্ধু নীরব হইবামাত্র বেশ একটু আগ্রহভরে বলিয়া উঠিলেন, "পারিবে? আমি টাকা যোগাড় করিতে প্রস্তুত আছি। কত টাকা যোগাড় করিলে তুমি ভাই আমায় আলাপ করাইয়া দিতে পারিবে?"

বন্ধু বেশ একটু গম্ভীর হইয়া বলিয়া উঠিলেন, "কিছু বেশী টাকার প্রয়োজন,—দু' দশ টাকায় হইবে না। অন্ততঃ গোটা পঞ্চাশেক টাকা জোগাড়ের দরকার। তারপর আমি দেখিয়া লইব কে কত বড় এক্ট্রেস।"

বন্ধুর কথায় অমরেন্দ্রনাথ যেন একটু নিরাশ হইয়া পড়িলেন। এত টাকা এক সঙ্গে তখন তাঁহার যোগাড় করা বড় কঠিন ছিল। তথাপি তিনি একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন না। মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন কি উপায়ে পঞ্চাশটী টাকা জোগাড় করিতে পারিবেন। সেই সময় তাঁহার বন্ধু আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "কিহে পঞ্চাশ টাকার জন্য তুমি যে একেবারে চুপ করিয়া গেলে! এক্‌টারের সঙ্গে আলাপ করা কি সহজ ব্যাপার! তুমি পঞ্চাশ টাকার কথা শুনিয়া চুপ করিয়া যাইতেছ, কিন্তু এই এক্‌টারের সঙ্গে আলাপ করিবার জন্য, এই যে একজন লোক পঞ্চাশ হাজার টাকা একদিনে খরচ করিয়া ফেলিয়াছিল!"

সেদিনকার মত সভা ভঙ্গ হইল। অমরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে ফিরিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার মনের বাসনা ভয়ানক বাড়িয়া উঠিয়াছিল। রাত্রে শয়ন করিয়া তিনি কেবলই চিন্তা করিতে লাগিলেন, "সত্যই এক্‌টারের সঙ্গে আলাপ করা সহজ ব্যাপার নয়। সত্যই কিছু টাকার প্রয়োজন। তাঁহারা শুধু শুধু কেন আমার সহিত আলাপ করিবেন? যাঁহারা অভিনয় করেন, তাঁহাদের সম্মান কত! পঞ্চাশ টাকা লইয়াও তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হওয়া উচিত নহে। পঞ্চাশ টাকা খরচ করিয়া তাঁহাদের যথোচিত সম্মান রক্ষা করা যায় না। এখন কি উপায়ে টাকা যোগাড় করিতে পারা যায়?" বিবাহের সময় অমরেন্দ্রনাথ মূল্যবান্ আংটী, ঘড়ী ও চেন যৌতুক পাইয়াছিলেন।

অনেক চিন্তার পর তাহার সেই তিনটীর কথা মনে পড়িল। তাঁহার প্রাণের আগ্রহ এমনই বৃদ্ধি পাইয়া উঠিয়াছিল যে তিনি আর কিছুতেই স্থির হইতে পারিতেছিলেন না। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন যে তাঁহার আংটী ও ঘড়ীর চেন বিক্রয় করিয়া কালই টাকা সংগ্রহ করিবেন এবং সেই টাকায় তাঁহার বন্ধুবর্গের সহিত থিয়েটারের কোন একজন অভিনেত্রীর সহিত পরিচিত হইতে যাইবেন।

এই সকল চিন্তায় তাঁহার বহু রাত্রি পর্য্যন্ত নিদ্রা হইল না। শেষে তিনি সেই চিন্তা করিতে করিতেই নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। পরদিন প্রভাতে উঠিয়াই তিনি তাঁহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য আংটী ও ঘড়ীর চেন জামার পকেটের ভিতর লুক্কায়িত ভাবে লইয়া বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। তাঁহারই প্রতীক্ষায় তাঁহার দলবল একস্থানে সকলে জুটিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ গৃহের ভিতর প্রবেশ করিবামাত্র, তাঁহারা সকলে উল্লাসে জয়ধ্বনি করিয়া উঠিলেন। অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার মনের কথা বন্ধুবর্গের নিকট ব্যক্ত করিলেন। তাঁহার কথা শুনিয়া বন্ধুবর্গের আর আনন্দ ধরে না। তাঁহারা সকলেই বলিয়া উঠিলেন, 'ভাই, তোমার ক্ষমতা আছে, তুমি পারিবে।'

মাঝখান হইতে একজন বলিয়া উঠিলেন, "আমার মতে একে-বারে আংটী ও চেন বিক্রয় করা উচিত নয়। এখন বাঁধা দেওয়া

যাক, এর পর যদি কখনও সুবিধা হয়, পুনরায় ছাড়াইয়া লওয়াও যাইতে পারিবে ?”

তাঁহারই পরামর্শ অনুযায়ী তথনই কার্য্য শেষ হইয়া গেল। একজন যাইয়া আংটী ও ঘড়ী চেন বাঁধা দিয়া তখনই একশত টাকা লইয়া আসিলেন। অমনি স্থির হইয়া গেল রাত্রে তাঁহারা অমরেন্দ্রনাথকে সঙ্গে লইয়া একজন অভিনেত্রীর সহিত পরিচিত হইতে যাইবেন। অভিনেত্রীর সহিত আলাপ করিতে যাইতে হইলে একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কাপড় জামার প্রয়োজন। দলের মধ্যে দু’একজনের তাহারও অভাব ছিল। অমরেন্দ্রনাথ তথনই হুকুম দিলেন, সেই টাকা হইতে তাঁহারা যেন কাপড় জামা কিনিয়া লয়েন। এই ভাবে তথনকার মত সভা ভঙ্গ হইয়া গেল।

সন্ধ্যার পরই বন্ধুগণ সুবেশে সুসজ্জিত হইয়া যথাস্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তাহার পর সকলে মিলিয়া তর্ক বিতর্কের পর কোথায় যাওয়া হইবে তাহাও স্থির হইল। তাঁহারা দুই চারিজন অভিনেত্রীর বাড়ী একে একে উপস্থিত হইলেন, কিন্তু কেহই তাঁহাদের স্থান দিল না। সকলেরই বাবু আছেন, সুতরাং তাঁহাকে বসাইতে কেহই রাজি নয়। অমরেন্দ্রনাথের এরূপ স্থানে এই প্রথম গমন। ইহাদের সহিত পরিচয় করিবারও তাঁহার যেমন বেশ একটা আগ্রহ ছিল, তেমনি কেমন যেন একটা ভয়ও প্রাণের ভিতর হইতেছিল। দুই চারি বাড়ী হইতে ফিরিবার পর তাঁহার

আর কোন বাড়ীতে যেন প্রবেশ করিতে সাহস হইতেছিল না। তিনি মৃদুস্বরে তাঁহার বন্ধুবর্গকে বলিলেন, "থাক ভাই, আজি আর কোথায়ও যাইয়া কাজ নাই, চল বাড়ী ফিরিয়া যাই।"

কিন্তু বন্ধুরা তখন একেবারে উন্মত্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তাঁহারা কোথায় না কোথায় না যাইয়া কিছুতেই বাড়ী ফিরিবেন না। কাজেই অমরেন্দ্রনাথকেও তাঁহাদের সহিত যাইতে হইল। অনেক বাড়ীতে ঘোরাঘুরির পর শেষে তাঁহারা একস্থানে আশ্রয় পাইলেন। এটী কোন থিয়েটারের অভিনেত্রী নয়, তবে নাকি ইনি একদিন অভিনেত্রী হইবার আশায় কোন এক থিয়েটারে গিয়াছিলেন ও থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ তাহাকে ভবিষ্যতে হইতে পারেন এমন আশাও দিয়াছিলেন।

অমরেন্দ্রনাথ তাহার বন্ধুবর্গের সহিত গৃহের ভিতর প্রবেশ করিলেন। গৃহের ভিতর প্রবেশ করিয়া গৃহের আসবাব পত্র দেখিয়া তিনি যেন একটু অবাক্ হইয়া যাইলেন। গৃহের মধ্যস্থলে বিছানা পাতা, সেই বিছানার এক পার্শ্বে যাইয়া অমরেন্দ্রনাথ মহা-সঙ্কোচে উপবিষ্ট হইলেন। তাঁহার বুকের ভিতর তখন সবলে স্পন্দিত হইতেছিল, গলা যেমন কেমন কাট হইয়া আসিতেছিল। তাঁহারা সেই ফরাসের উপর উপবিষ্ট হইবার অতি অল্পক্ষণ পরেই একজন বেহারা আসিয়া একটা প্রকাণ্ড জরিদার গুড়গুড়িতে একটা প্রকাণ্ড কলিকা বসাইয়া দিয়া গেল। অমরেন্দ্রনাথের একজন বন্ধু সেই গুড়গুড়ির প্রকাণ্ড নলটা তুলিয়া

লইয়া মৃদু মৃদু টানিতে লাগিলেন। সেই সময় সেই গৃহের অধিষ্ঠাত্রী ঠাকুরাণী আসিয়া সেই ফরাসের মধ্যস্থলে উপবিষ্ট হইয়া মৃদু হাসিয়া বলিলেন, "নিন, একটা পান খান।" অমরেন্দ্রনাথ নিষ্পলক নয়নে সেই ললনার মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

প্রায় সমুদায় ধনীর সন্তানের অধঃপাতের ইতিবৃত্ত এইরূপই বটে। প্রায় সকলকেই প্রথমে উৎকট কৌতূহলের বশবর্ত্তী হইয়া সাঙ্গোপাঙ্গের কুপরামর্শে কুস্থানে গমন করিতে হয়। উহাতে সকলেরই প্রথমে বক্ষ স্পন্দিত হয়, চিত্ত অপ্রসন্ন হয়। কিন্তু ক্রমে এমনই মহামোহমদিরা চিত্ত অধিকার করিয়া বসিতে থাকে, যে অহিফেন-সেবীর ন্যায় তাহাকে প্রত্যহ তথায় না যাইয়া আর উপায় থাকে না। ইহাই তরুণ ধনি-তনয়ের পতঙ্গ-বৃত্তি। *

---

* এই দারুণ সংসর্গদোষের কথা অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার 'আদর' নামক উপন্যাসে বেশ পরিস্ফুটভাবে বুঝাইয়া দিয়াছেন। আদর, তৃতীয় পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় উল্লাস।

—— * ——

সাধনার প্রথম সফলতা।

অতি শৈশব হইতেই একজন নট হইবার ইচ্ছা প্রাণে বলবতী হওয়ায় অমরেন্দ্রনাথ ক্রমে একরূপ উন্মত্ত-প্রায় হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার সঙ্গিগণ তাঁহার সেই দুর্ব্বলতার সুযোগ পাইয়া তাঁহাকে নানারূপ মিথ্যা প্রলোভন দেখাইয়া মাঝে মাঝে এইরূপ নানা কুস্থানে লইয়া যাইতে লাগিলেন। অসৎসঙ্গের যাহা পরিণাম হয় অমরেন্দ্রনাথেরও ক্রমেই সেইরূপ হইতে লাগিল। এই সকল স্থানে যাইতে প্রথম প্রথম তাঁহার যেরূপ সঙ্কোচ বোধ হইত ক্রমেই তাঁহার সেই সঙ্কোচের ভাবটা কাটিয়া যাইতে লাগিল। এক্ষণে এই সকল স্থানে যাইয়া তিনি বেশ একটু আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলেন। তিনি কত বড় সম্ভ্রান্ত বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার পিতা ও ভ্রাতারা সমাজের কিরূপ শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া আছেন— এ সকল কথা তাঁহার একবারও মনে হইল না। তিনি পাপের স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া নিজেকে ধ্বংসের মুখে অগ্রসর করিয়া দিলেন।

অমরেন্দ্রনাথ ক্রমেই যে অধঃপাতে যাইতেছেন তাঁহার মধ্যম ভ্রাতা সুপণ্ডিত আদর্শ-চরিত্র শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় তাহা যে লক্ষ্য করিতেছিলেন না তাহা নহে, কিন্তু অমরেন্দ্রনাথকে শাসন করিতে যাইলেই পিতা বিরক্ত হন, সেই কারণে তিনি আর অমরেন্দ্র-নাথকে কোন কথা বলিতেন না। কিন্তু যখন লোক পরম্পরায় শুনিলেন যে তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাদের বংশের মর্য্যাদা ভুলিয়া কুসঙ্গীদের কুপরামর্শে অতি কুস্থানে যাইতে আরম্ভ করিয়াছেন, তখন তিনি আর নীরব থাকিতে পারিলেন না। তিনি যাহা শুনিয়াছিলেন সমস্তই পিতৃপদে নিবেদন করিলেন। পুত্রপ্রাণ দ্বারকানাথ সমস্ত শুনিয়া বলিলেন, 'যে উচ্ছন্ন যাইবে তাহাকে কি আর ধরিয়া রাখা যায়? নিরর্থক মার ধর করিয়া ফল কি? নিজে যদি উচ্ছন্ন যায় নিজেই কষ্ট পাইবে।' হীরেন্দ্র বাবু পিতার এ কথায় সন্তুষ্ট হইতে পারিলেন না, কিন্তু কোন কথাও কহিলেন না। বিনা শাসনে অমরেন্দ্রনাথ ধীরে ধীরে পাপপঙ্কে নিমজ্জিত হইতে লাগিলেন।

অমরেন্দ্রনাথের বয়স অনুমান যখন ১৩।১৪ বৎসর সেই সময় তাঁহার পিতা শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ দত্ত মানবলীলা সংবরণ করিলেন। পিতার পরলোক প্রাপ্তির পূর্ব্বে অমরেন্দ্রনাথের অসৎপথে যাইবার প্রথম কিছু কিছু বিঘ্ন হইয়াছিল অর্থের অভাবে। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর আর তাঁহার সে অভাব রহিল না। তিনি যথেচ্ছ পয়সা উড়াইতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার এই অমিতব্যয়িতায় তাঁহার অগ্রজ উভয়

ভ্রাতাই বিরক্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহারা একদিন অমরেন্দ্রনাথকে ডাকিয়া অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু 'চোরা না শুনে ধর্ম্মের কাহিনী।' অমরেন্দ্রনাথের উপর তখন তাঁহার অসৎ সঙ্গের প্রভাব এতদূর বিস্তৃত হইয়াছিল যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাদের শত উপদেশ তাঁহার কর্ণেও প্রবেশ করিল না, বরং ফল বিপরীত হইল। তিনি অল্পদিন পরেই তাঁহার বিষয় সম্পত্তি ভ্রাতাদের নিকট হইতে পৃথক্ করিয়া লইলেন এবং নিজে সম্পূর্ণ স্বাধীন হইয়া একটা থিয়েটারের দল বসাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। তাঁহার সঙ্গীরা তাঁহার এই চেষ্টায় শতরূপে সহানুভূতি দেখাইয়া তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে লাগিলেন।

শৈশব হইতেই নিজে নট হইবার একটা দারুণ ইচ্ছা ছিল, তাহার উপর বন্ধুবর্গের উৎসাহ,—এদিকে পিতার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে হাতেও যথেষ্ট টাকা আসিয়া পড়িয়াছে,—অত সুবিধা এক সঙ্গে মিলিত হইলে আর নট হইবার অধিক বিলম্ব হয় না। অমরেন্দ্রনাথ অতি সত্বরই তাঁহার বন্ধুবর্গকে লইয়া একটী থিয়েটারের দল গঠন করিলেন। বাগবাজারের একটী বাগানে এই দলের মহালা চলিতে লাগিল। অভিনয়ের জন্য পুস্তক স্থির হইল—পলাশীর যুদ্ধ। বাগানে পলাশীর যুদ্ধের মহালা যত চলুক আর নাই চলুক, বন্ধুবর্গের আমোদ প্রমোদের কোনই অভাব ছিল না,—চব্বিশ ঘণ্টাই আমোদ প্রমোদের তুফান বহিতে লাগিল। অর্থও রাশি রাশি ব্যয় হইতে লাগিল। অর্থও যেমন দুই হস্তে ব্যয় হইতে লাগিল, দলও ততই ভরাট

হইয়া উঠিতে লাগিল। প্রায় ছয় মাসকাল পলাশীর যুদ্ধের মহালা দিবার পর, উহা কোথায় অভিনয় করা হইবে তাহারই পরামর্শ চলিতে লাগিল। অনেক পরামর্শের পর স্থির হইল, যে মিনার্ভা থিয়েটারের বাটী ভাড়া লইয়া এক রাত্রি পলাশীর যুদ্ধ অভিনয় করা হইবে। এক দিন কয়েকজন বন্ধু যাইয়া মিনার্ভা থিয়েটার ভাড়া করিয়া আসিলেন, এবং অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার বন্ধুবর্গকে লইয়া মহা-ধূমধামে এক রাত্রি পলাশীর যুদ্ধের অভিনয় করিলেন। অমরেন্দ্রনাথের এই প্রথম নটরূপে রঙ্গমঞ্চে আবির্ভাব। পলাশীর যুদ্ধে অমরেন্দ্রনাথ সিরাজের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ভূমিকাটি তিনি সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন। তখন তাঁহার সেই অভিনয় যেই দেখিয়াছে সেই শত মুখে তাঁহার সুখ্যাতি করিয়াছে। এই অভিনয় সম্বন্ধে অমরেন্দ্রনাথ নিজে যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে আমরা উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

"সে আজ বহু দিনের কথা। আমি তখন বিংশ বর্ষীয় যুবক। নাট্য শিল্পের প্রতি আমার আশৈশব অনুরাগ। নটের লাঞ্ছনা আমাদের দেশে চিরপ্রসিদ্ধ। নাট্য শিল্পের উন্নতি-সাধনে সকলেই উদাসীন। এই সকল দেখিয়া শুনিয়া নিজের পথ নিজেই ঠিক করিয়া লইলাম। প্রতিপদে অনেক বাধা, অনেক বিঘ্ন, অনেক প্রতিবাদ, অনেক লাঞ্ছনা গঞ্জনা আমায় ভোগ করিতে হইয়াছে। কিন্তু চির-পোষিত কর্ত্তব্য হইতে কখনই কিছুতেই বিচলিত হই নাই।

নাট্য শিল্পের উন্নতির জন্য লাঞ্ছনার গুরুভার সানন্দে মস্তকে ধারণ করিয়াছি। সর্ব্ব প্রথমে আমি মিনার্ভা থিয়েটার ভাড়া লইয়া গিরিশ বাবুর সাহায্যে তাঁহারই দ্বারা নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত কবিবর ৺নবীনচন্দ্র সেনের পলাশীর যুদ্ধ অভিনয় করি। আমি সিরাজের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলাম। এই চরিত্র লইয়া রঙ্গমঞ্চে দাঁড়াইয়া আমি প্রথম অভিনয় করি। চতুর্থ অঙ্ক অভিনয়ার্থ যখন ঐকতান-বাদন হইতেছিল,—এমন সময় দেখিলাম পূজ্যপাদ গিরিশ-চন্দ্র এক শান্ত সৌম্য সুন্দর পুরুষের হস্ত ধারণ করিয়া আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। সসম্ভ্রমে আমি উঠিয়া দাঁড়াইলাম। অনিমেষনেত্রে আগন্তুকের সেই অনিন্দ্য-সুন্দর প্রতিভা-দীপ্ত মূর্ত্তি ক্ষণকাল দেখিলাম। অলক্ষ্যে অন্তরমধ্যে শ্রদ্ধা ও ভক্তি, বিনয় ও নম্রতা, আশা ও আকাঙ্ক্ষা জাগরিত হইতে লাগিল। সেই অভ্যাগত —নবীন অপরিচিতের চরণপ্রান্তে প্রণত হইবার জন্য মস্তক নত হইয়া পড়িল। গিরিশ বাবু আমাকে ডাকিয়া বলিলেন,—"অমর, কে আসিয়াছেন বল দেখি ?"

আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তখন গিরিশ বাবু কহিলেন,—"ইনিই কবি নবীনচন্দ্র।"

"পলাশীর যুদ্ধ" প্রণেতা কবিচূড়ামণি নবীনচন্দ্র—আমার সম্মুখে! আনন্দে আপ্লুত হইয়া কবিবরের চরণ ধারণ করিলাম। তখনও পলাশীর যুদ্ধের সকল কথাই কাণে বাজিতেছিল, তখনও কবির

রসময়ী লেখনী ভঙ্গে অন্তরে বিবিধ রসের তরঙ্গ উঠিতেছিল, তখনও দর্শকবৃন্দের পুলক-পূরিত করতালিধ্বনি রঙ্গালয় মুখরিত করিতেছিল—এই সকলের মধ্যে আবার গিরিশবাবুর গুরু গম্ভীর বাণী—আমার প্রাণে এক অপূর্ব্ব আবেগ আনিয়া দিল। নবীনচন্দ্র তাঁহার কোমল হস্তে আমার হস্ত ধারণ করিয়া সস্নেহে আমায় উঠাইলেন—মাথায় হাত দিয়া আমায় আশীর্ব্বাদ করিলেন। আমার জীবন সার্থক হইল। দরিদ্রের অর্থলাভ অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান্ সামগ্রী আমি লাভ করিলাম। কবিবরের অকৃত্রিম স্নেহলাভে আমি ধন্য হইলাম। তিনি আমার অভিনয় সম্বন্ধে অনেক কথা বলিলেন। সে সকল কথার উল্লেখ করিলে আত্ম-প্রশংসা করা হয়। আত্ম-প্রশংসা গুরুতর মহাপাপ।"

"এই ঘটনার কিছুদিন পরে একদিন নিমন্ত্রিত হইয়া গিরিশ-বাবুর সঙ্গে আমি কবিবরের বাটীতে গমন করিলাম। তিনি যেরূপ সরল ভাবে আমাকে অভ্যর্থনা করিলেন, তাহাতে আমি প্রকৃতই মুগ্ধ হইয়াছিলাম। উত্তুঙ্গ গিরিপ্রতিম কুরুক্ষেত্র ও রৈবতক মহাকাব্য যাঁহার সৃষ্টি, তাহার মুখে অকৃত্রিম সরলতা—তাহার স্বভাব পঞ্চমবর্ষীয় বালকের ন্যায়! আমাদের সহিত কত কথাই কহিলেন। অনিমেষনয়নে আমি তাঁহার সেই প্রতিভা-প্রদীপ্ত মুখের দিকে চাহিয়া রহিলাম। পলাশীর যুদ্ধের কথা উত্থাপিত হওয়ায় গিরিশবাবু কবিবরকে "ক্রম করি দূরে তোপ গর্জ্জিল

আবার” এই পঙ্‌ক্তিটী সম্বন্ধে বলিলেন, যে উহা Lord Byronএর Child Haroldএর 3rd Cantoএর 22nd Stanza হইতে অনুকৃত। Byron Waterloo যুদ্ধের পূর্ব্বের রাত্রির বর্ণনা করিয়াছেন, আর উক্ত পংক্তিটী পলাশীর যুদ্ধের পূর্ব্বাবস্থা বর্ণনায় প্রযুক্ত হইয়াছে। এই কথা বলিয়া গিরিশবাবু নবীনবাবুকে জানাইলেন, যে “তাঁহার বিবেচনায় অনুবাদটি তেমন পরিস্ফুট হয় নাই। গিরিশবাবুর কথা শুনিয়া কবিবর তাঁহাকে বলিলেন, “আপনি হইলে ইহার কিরূপ অনুবাদ করিতেন ?”

গিরিশবাবু চিন্তা না করিয়াই তৎক্ষণাৎ বলিলেন,—

নিকটে বিকট পুনঃ বিপুল গর্জ্জন,
যে যেখানে অস্ত্র ধর কামান ভীষণ।

উহাতে কবি নতশিরে অনুবাদকের নিকট পরাভব স্বীকার পূর্ব্বক তাঁহার অনুবাদের প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং নিজের লেখার প্রতিবাদে কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত হইলেন না।

কবিবরের এই সহোদরভাব দর্শনে আমি বিস্মিত ও মোহিত হইলাম। নবীনচন্দ্রের সরলতা, সহৃদয়তা, ও উদারতার তুলনা ছিল না। বস্তুতঃ সরলতা ও সহৃদয়তাই জগতের প্রাণ। তাই একটী সরল, উদার, সহৃদয় প্রাণ চলিয়া গেলে স্বতঃই যেন মনে হয় যে পৃথিবীটা শূন্য হইয়াছে।”

অমরেন্দ্রনাথ আশৈশব যে প্রাণের কামনা সাধনের জন্য কত

লাঞ্ছনা, কত তাড়না সহ্য করিয়াও নিরাশ হন নাই, এত দিনে তাঁহার সেই বাসনা ফলবতী হইল। ঈশ্বর-দত্ত একটা বিরাট্ শক্তি তাঁহার ভিতরে বিরাজমান ছিল, শত বাধা বিপত্তিতেও তাহা লুপ্ত হয় নাই। সিরাজের ভূমিকায় প্রথম অভিনয়েই তাহা বিকসিত হইয়াছিল। সেদিনকার প্রত্যেক দর্শকই তাঁহার অভিনয়ের ভূরি ভূরি প্রশংসা করিয়াছিলেন। এমন কি তাঁহার আত্মীয় স্বজন, যাঁহারা তাঁহাকে এই নটজীবন গ্রহণের জন্য কত গঞ্জনা দিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও বলিতে হইয়াছিল "হাঁ, কালু আমাদের অভিনয়টা করিয়াছে সত্য।"

বাটীতে অমরেন্দ্রনাথের আত্মীয় স্বজন সকলেই তাঁহাকে কালু বলিয়া ডাকিতেন। তাঁহার ডাক নাম ছিল কালু। মিনার্ভা থিয়েটার ভাড়া লইয়া অভিনয় করিবার পর আরও একবার অমরেন্দ্রনাথ কোরিন্থিয়ান থিয়েটার ভাড়া লইয়া এক রাত্রি অভিনয় করেন। * এইরূপ দুই এক রাত্রি থিয়েটারভাড়া লইয়া অভিনয় করিবার পর একটী স্থায়ী থিয়েটার খুলিবার ইচ্ছা অমরেন্দ্রনাথের প্রাণের ভিতর জাগিয়া উঠে। সেই সময় হইতে তিনি একটী থিয়েটার খুলিবার

---

* সুপ্রসিদ্ধ কবি শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত করিন্থিয়ান থিয়েটারে সেই দিন অমরেন্দ্রনাথের পলাশীর যুদ্ধের অভিনয়ের দর্শক ছিলেন বলিয়া অমরেন্দ্র বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ হরীন্দ্রনাথ দত্তের নিকটে স্বয়ং প্রকাশ করিয়াছেন।

জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠেন। কিন্তু এই কয়েক বৎসর জলস্রোতের ন্যায় অর্থ ব্যয় হওয়ায় তখন তাঁহার হাতে টাকা পয়সার বিশেষ সচ্ছলতা ছিল না। কাজেই ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করা তাঁহার পক্ষে তখন বড় সহজ ব্যাপার ছিল না। ভবিষ্যতে যে কোথায়ও সঞ্চিত অর্থ পাইবেন সে আশাও তাঁহার ছিল না। কাজেই তাঁহাকে বেশ একটু চিন্তিত করিয়া ফেলিল। কিন্তু তিনি হতাশ হইলেন না। কি উপায়ে একটী স্থায়ী থিয়েটার খোলা যাইতে পারে, দিবা-রাত্র কেবল সেই চিন্তাই করিতে লাগিলেন।

বিশ বৎসরের একটী সংসারানভিজ্ঞ বালক, হাতে একটী পয়সা নাই, সে কি কল্পনাও করিতে পারে যে 'আমি একটী থিয়েটার খুলিব?' অমরেন্দ্রনাথের বয়স তখন কেবলমাত্র বিংশতি বৎসর, হাতে একটী পয়সা নাই তথাপি তাঁহার আশা থিয়েটার খুলিবেন। অমরেন্দ্রনাথের ভগবদ্দত্ত একটী ক্ষমতা ছিল যাহার গুণে তিনি অতি সহজেই সকলের অতি আপনার জন হইতে পারিতেন। এক্ষণে কেবল সেই শক্তির উপর নির্ভর করিয়া তিনি থিয়েটার খুলিবার মতলব আঁটিতে লাগিলেন। প্রায় এক বৎসর ধরিয়া অজস্র পিতৃধন নষ্ট করিয়া অমরেন্দ্রনাথের একটী লাভ হইয়াছিল যে, থিয়েটার-সংক্রান্ত এমন কোন অভিনেতা বা অভিনেত্রী ছিলেন না যাহার সঙ্গে তাঁহার বিশিষ্টরূপে আলাপ হয় নাই। সকলেই তাঁহাকে বেশ একটু প্রীতির চক্ষে দেখিতেন। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্ত চুণিলাল দেব, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র

বসু, শ্রীমতী তারাসুন্দরী, শ্রীমতী কুসুমকুমারী—এই কয়েক জনের সহিত তাঁহার আলাপ কিছু অধিক দিনের। তিনি তাঁহার প্রাণের ইচ্ছা একদিন তাঁহাদের নিকট ব্যক্ত করিলেন। তাঁহারা সকলেই তাঁহাকে বিশেষ ভরসা দিলেন। তাঁহারা তাঁহাকে একরূপ কথাই দিলেন যে তিনি যদি থিয়েটার খুলেন তাহা হইলে তাঁহারা নিশ্চয়ই তাঁহার থিয়েটারে যোগ দান করিবেন। এইরূপে অভিনেতা ও অভিনেত্রী ঠিক করিবার পর অমরেন্দ্রনাথ একটী থিয়েটারের বাটী ভাড়া লইবার জন্য চেষ্টা করিতে আরম্ভ করিলেন। শ্রীযুক্ত গোপাললাল শীলের প্রতিষ্ঠিত এমারেল্ড থিয়েটার তখন নানাকারণে বন্ধ ছিল। উক্ত থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ তাঁহাদের সেই থিয়েটারটি হস্তান্তর করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছিলেন। সেই সময় অমরেন্দ্রনাথ গোপাল বাবুর নিকট থিয়েটারটী ভাড়া চাহিলেন। গোপালবাবু অমরেন্দ্রনাথের জ্যেষ্ঠসহোদর শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয়ের একজন বন্ধু ছিলেন। তিনি অমরেন্দ্র-নাথকেও চিনিতেন। সুতরাং অমরেন্দ্রনাথের প্রস্তাবে তিনি বলিলেন—"তুমিতো ধীরেণের ছোট ভাই! তুমি যে তোমার জীবন এইভাবে নষ্ট করিবে তাহা আমি কোনও প্রকারে অনুমোদিত করিতে পারি না। যাও, তোমাকে আমি থিয়েটার ভাড়া দিব না।" অমরেন্দ্রনাথ এইরূপে বিফল-কাম হইয়া শীল মহাশয়ের একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুকে ধরিয়া বসিলেন। সেই বন্ধুবরের সনির্ব্বন্ধ

অনুরোধে অনেক তর্ক-বিতর্কের পর তিনি স্বীকৃত হইয়া উপযুক্ত লেখাপড়া করিয়া থিয়েটার বাটী অমরেন্দ্রনাথকে ভাড়া দিলেন। থিয়েটার বাটী ভাড়া পাইয়া অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার বাল্যসুহৃদ্ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত থিয়েটার গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলেন গৃহটী ধূলি-সমাচ্ছন্ন ও সম্পূর্ণ সংস্কার ব্যতীত অব্যবহার্য্য। যাহা হউক, তিনি নবোদ্যমে, মহোৎসাহে থিয়েটার খুলিবার আয়োজন আরম্ভ করিয়া দিলেন।

চতুর্থ উল্লাস।

ক্লাসিকে অভিনয়-লীলা।

থিয়েটার বাটী অনেক কষ্টে জোগাড় হইল বটে, কিন্তু কেবল থিয়েটার বাটী হইলেই তো আর থিয়েটার হয় না। থিয়েটার খুলিতে হইলে থিয়েটারের প্রধানতম উপাদান অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন। কিন্তু অভিনেতা ও অভিনেত্রী জোগাড় হইবে কেমন করিয়া? জোগাড় করিবার প্রধান সহায় অর্থ,—

তাহাই তাঁহার নাই। যে সময় অমরেন্দ্রনাথ এমারেল্ড থিয়েটার ভাড়া লইবেন, সেই সময় তাঁহার হস্তে একটী পয়সাও ছিল না বলিলে অত্যুক্তি হয় না—সত্যই তখন তিনি অর্থের অভাব প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেছিলেন। যাঁহারা থিয়েটার ভাড়া লইবার পূর্ব্বে তাঁহার থিয়েটারে যোগদান করিবার অঙ্গীকার করিয়াছিলেন তাঁহারা এক্ষণে অনেকেই তাঁহার থিয়েটারে আসিতে অস্বীকার করিলেন। আবার কেহ কেহ এত অধিক দাবী করিলেন যে তাহা প্রদান করা তখন অমরেন্দ্রনাথের একেবারেই সাধ্যের বাহিরে ছিল। থিয়েটার ভাড়া লইয়া অমরেন্দ্রনাথকে কাজে কাজেই মহাবিপদে পড়িতে হইল। তখন তাঁহার বয়স কেবলমাত্র বিশ বৎসর। বিংশতি বৎসরের একটী যুবক,—তাহার সংসার জ্ঞান কতটুকু হইতে পারে! তিনি সরল মনে সকলেরই কেবল কথার উপর নির্ভর করিয়া অত্যন্ত গুরুতর দায়িত্বপূর্ণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। একবারও ভাবেন নাই যে, যাঁহারা তাঁহাকে থিয়েটার ভাড়া লইবার জন্য পূর্ব্বে নাচাইয়াছেন,—তাঁহারাই এক্ষণে সরিয়া দাঁড়াইবেন। অমরেন্দ্রনাথ এতদিন স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া পিতৃদত্ত অর্থ দুই হস্তে ব্যয় করিরা আমোদ প্রমোদেই দিন কাটাইয়া আসিতেছিলেন। এরূপ ভাবে যে কখনও ঠেকিতে হইবে সে কথা তাঁহার একবারও মনে উদিত হয় নাই। যাঁহাদের চিরকাল তিনি বন্ধু ভাবিয়া আসিতেছিলেন, অর্থ ফুরাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাদের অনেকেই তাঁহাকে ছাড়িয়া গিয়াছিলেন। শেষে কয়েকজন

মাত্র বাকি ছিলেন, থিয়েটার ভাড়া লইবার পর তাহারাও তাঁহাকে অকূল পাথারে ভাসাইয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইলেন। এত বিপদেও অমরেন্দ্রনাথ একেবারে দমিলেন না। ঈশ্বর দত্ত তাঁহার একটা অদ্ভুত শক্তি ছিল যে তিনি কিছুতেই দমিতেন না। হাতে পয়সা নাই, একজনও সহায় নাই, তথাপি তিনি আশা ছাড়িলেন না। তখন 'একাই একশো' হইয়া থিয়েটার খুলিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে লাগিলেন।

এই দুর্দ্দিনে কেবল একজন তাঁহাকে ছাড়িলেন না। একমাত্র শ্রীযুক্ত চুণিলাল দেব তখনও তাঁহার সহায় রহিলেন। চুণি বাবুর সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়া অমরেন্দ্রনাথ এইটুকু বুঝিয়াছিলেন যে, যে যাহাই বলুক চুণি বাবু তাঁহার দলে যোগদান নিশ্চয়ই করিবেন। যখন তিনি আছেন ও চুণি বাবু আছেন, তখন অভিনেতার বড় বেশী অভাব হইবে না, যেমন করিয়া হউক অভিনেতা একরূপ যোগাড় হইয়া যাইবে। কিন্তু বিনা অর্থে অভিনেত্রী পাওয়া কঠিন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন বঙ্গ নাট্যশালায় অভিনেত্রীর বড়ই অভাব। তখন বঙ্গ নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষগণ অভিনেত্রীর অভাব প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন। আজি কালিকার মতন তখন হরি, খেঁদী টেপী প্রভৃতি অভিনেত্রী ছিল না। তখন অভিনেত্রী হইতে হইলে নানারূপ পরীক্ষা দিতে হইত। নাট্যশালার কর্ত্তৃপক্ষগণ রীতিমত যাচাই না করিয়া কাহাকেও অভিনেত্রী করিতেন না। কাজেই একটী বিশ বৎসরের তরুণ অনভিজ্ঞ যুবকের পক্ষে অভিনেত্রী সংগ্রহ করা একরূপ

অসম্ভব ছিল। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের অভিধানে অসম্ভব বলিয়া কোন শব্দই ছিল না। কাজেই তিনি একেবারে হতাশ হইয়া পড়িলেন না।

বিপুল পিতৃধন নষ্ট করিয়া অমরেন্দ্রনাথের অপর কিছু লাভ হউক আর না হউক একটা কিন্তু লাভ হইয়াছিল। বঙ্গ নাট্যশালার অধিকাংশ লোকের নিকটেই তিনি বিশেষভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন। অভিনেত্রীদিগের মধ্যে অভিনেত্রীকুলমণি শ্রীমতী তারাসুন্দরী ও শ্রীমতী কুসুমকুমারী, অমরেন্দ্রনাথকে, কেন জানি না, একটু বিশেষ দৃষ্টিতে দেখিতেন। অমরেন্দ্রনাথ একদিন সন্ধ্যার পর শ্রীমতী তারা-সুন্দরীর সহিত তাঁহার বাটীতে সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাঁহাকে একাকী পাইয়া তাঁহার প্রাণের সমস্ত কথাই তাঁহার নিকট বিবৃত করিয়া বলিলেন, "তোমায় আমার থিয়েটারে যোগ-দান করিতে হইবে। তুমি তো আমায় বলিয়াছিলে আমি যদি থিয়েটার খুলি তাহা হইলে তুমি তাহাতে যোগ দান করিবে।"

অমরেন্দ্রনাথের মুখে সমস্ত কথা শুনিয়া তারাসুন্দরী উত্তর দিলেন, "আমার যোগ দিতে কোন আপত্তি নাই, কিন্তু এ সময় কি আমার থিয়েটার করা উচিত?"

দুই দিন আগে যে অভিনেত্রী তাঁহার থিয়েটারে যোগ দিতে স্বীকৃত ছিল, যে তাঁহাকে থিয়েটার করিতে কত উৎসাহিত করিয়াছে, সহসা তাহার মুখে এই কথা শুনিয়া অমরেন্দ্রনাথ হৃদয়ে বিশেষ বেদনা অনুভব করিলেন এবং মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন যেমন

করিয়াই হউক শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে নিজের থিয়েটারে লইয়া আসিবেন। কিন্তু সে কথা তারাসুন্দরীর নিকট ব্যক্ত করিলেন না। তিনি তাঁহার মনের ইচ্ছা মনেই গোপন করিয়া সে দিনকার মত সেস্থান হইতে চলিয়া আসিলেন। তিনি শ্রীমতী তারাসুন্দরীর উপর ক্ষুণ্ণ হইলেন বটে, কিন্তু তিনি তারার অবস্থার কথাটা একবারও চিন্তা করিলেন না। তিনি নূতন থিয়েটার খুলিতেছেন। তাঁহার বয়স কেবল মাত্র কুড়ি বৎসর। তাঁহার দ্বারা থিয়েটার চলিবে কিনা প্রভৃতি নানা কথা ভাবিয়া দেখিলে সে সময় শ্রীমতী তারাসুন্দরী কেমন করিয়া একটা বহু দিনের সুবিখ্যাত প্রথম শ্রেণীর থিয়েটার ছাড়িয়া তাঁহার নূতন থিয়েটারে যোগদান করিতে পারে? কিন্তু শ্রীমতী তারাসুন্দরীর উপর অমরেন্দ্রনাথের বেশ একটি অপ্রতিহত শক্তি ছিল। তিনি জানিতেন তারা মুখে যতই আস্ফালন করুক তাহাকে তাঁহার থিয়েটারে আসিতেই হইবে, কারণ অমরেন্দ্রনাথ যখন ইণ্ডিয়ান ড্রামেটিক ক্লাবের পরিচালক ছিলেন, তখন শ্রীমতী তারাসুন্দরী ইণ্ডিয়ান ড্রামেটিক ক্লাবে অভিনয় করিত। এই ইণ্ডিয়ান ড্রামেটিক ক্লাবই অমরেন্দ্রনাথের প্রথম থিয়েটার। এই থিয়েটার দলের স্থায়ি কোন নাট্যশালা ভাড়া ছিল না। যখনই যে নাট্যশালায় সুবিধা হইত তাঁহারা সেইখানে তাঁহাদের অভিনয় করিতেন। অমরেন্দ্রনাথ, ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র-নাথ ঘোষ (দানীবাবু), শ্রীযুক্ত চুণিলাল দেব, শ্রীযুক্ত নিখিলেন্দ্র-কৃষ্ণ দেব, ৺প্রবোধচন্দ্র ঘোষ, শ্রীমতী তারাসুন্দরী প্রভৃতিকে লইয়া

এই দল গঠিত করেন। এই দল প্রথম এমারেল্ড-থিয়েটারে অভিনয় করেন, তাহার পর এই সম্প্রদায় মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয় করিবার বন্দোবস্ত করেন। শেষে একদিন বেঙ্গল থিয়েটারেও এই সম্প্রদায়ের অভিনয় হয়। বেঙ্গল থিয়েটারে এই সম্প্রদায় ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের বিষাদ পুস্তকের অভিনয় করিয়াছিলেন। এই বিষাদ পুস্তকের অভিনয়েও অমরেন্দ্রনাথ নায়কের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন এবং বিশেষ সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন! কাজেই এ অবস্থায় অস্বীকার করিলেও অমরেন্দ্রনাথ বেশ জানিতেন শ্রীমতী তারাসুন্দরীকে তাঁহার থিয়েটারে আনয়ন বড় কঠিন হইবে না। ইহা ব্যতীত শ্রীমতী তারাসুন্দরী অমরেন্দ্রনাথের নিকট আরও নানারূপে আবদ্ধ ছিল।

অমরেন্দ্রনাথ প্রায় দুই মাস কাল অহোরাত্র চেষ্টা করিবার পর কয়েকজন অভিনেতা ও অভিনেত্রী সংগ্রহ করিয়া একটী সম্প্রদায় গঠন করিলেন এবং এমারেল্ড থিয়েটারের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া ক্লাসিক থিয়েটার নাম দিয়া ৺গিরিশচন্দ্র ঘোষের হারানিধি নাটকের মহালা আরম্ভ করিয়া দিলেন। তিনি যে তারাসুন্দরীকে তাঁহার থিয়েটারে আনিবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছিলেন, বলা বাহুল্য, তিনি তাঁহার সে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিয়াছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ, শ্রীমতী তারাসুন্দরী, শ্রীমতী কুসুমকুমারী ও শ্রীযুক্ত চুণিলাল দেব প্রভৃতিকে লইয়া ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ২৭শে চৈত্র, প্রথম মহালা বসান ও নব বৎসরের সঙ্গে সঙ্গে

নূতন উদ্যোগে ও অদমনীয় উৎসাহে মহাসমারোহে অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিক থিয়েটারের জীবন প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ক্লাসিক থিয়েটার খোলার তারিখ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু মতীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় নাট্যমন্দিরে লিখিয়াছেন,—

"১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফাল্গুন তারিখে অমরেন্দ্রনাথ, চুণিলাল দেব, তারাসুন্দরী, কুসুমকুমারী প্রভৃতিকে লইয়া ৬৮ নং বিডন-ষ্ট্রীটে "ক্লাসিক" থিয়েটারের উদ্বোধন করেন। ইহার পূর্ব্বে অমরেন্দ্রনাথ ইংলিশ থিয়েটার ও পরে মিনার্ভা থিয়েটার ভাড়া লইয়া নাট্যাভিনয় করিয়াছিলেন।" *

ক্লাসিক থিয়েটার প্রথম যে রাত্রিতে খোলে সে রাত্রে পলাশীরযুদ্ধ ও বেল্লিক বাজার অভিনয় হয়। এই রাত্রে অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার নূতন থিয়েটারে নূতন সাজে ৺ নবীনচন্দ্র সেনের 'পলাশীর যুদ্ধে' সিরাজের ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং ভূমিকাটি যতদূর সুন্দর হওয়া সম্ভব

---

* মতীন্দ্র বাবু অনেক দিন ক্লাসিক থিয়েটারে কার্য্য করিয়াছিলেন; সুতরাং তাঁহার উক্তি অধিকতর শ্রদ্ধেয় ও আদরণীয়। বিশেষতঃ ২৭শে চৈত্র প্রথম মহালা বসাইয়া ১লা বৈশাখ সমুদায় সাজ সরঞ্জামসহ একটী নূতন থিয়েটার খোলা একরূপ অসম্ভব। তবে 'পলাশীর যুদ্ধ' তাঁহাদের ইণ্ডিয়ান ড্রামেটিক ক্লাবের পুরাতন নাটক এবং এমারেল্ডের দৃশ্যপটাদি একরূপ ছিল, তাই চারি পাঁচ দিনেও প্রথম অভিনয় হওয়া নিতান্ত অসম্ভব বলিয়াও মনে করা যায় না।

তাহা অভিনয় করিয়াছিলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয়, অত আয়োজন সত্ত্বেও দর্শক সংখ্যা তেমন হইল না। পলাশীর যুদ্ধ ইতিপূর্ব্বে বহুবার অভিনয় হইয়া গিয়াছে, সেই জন্য বোধ হয় দর্শক সমাগমের অভাব হইল এইরূপ চিন্তা করিয়া অমরেন্দ্রনাথ সেই দিন হইতেই একখানি নূতন নাটক লিখিতে আরম্ভ করিয়া দেন এবং অতি শীঘ্রই একখানি নাটক রচনা করেন। এই নাটক খানির নাম হরিরাজ। † অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার রচিত হরিরাজ নাটকের মহালা আরম্ভ করিয়া দেন এবং মহাসমারোহে এই হরিরাজ নাটকের প্রথম অভিনয় হয়। হরিরাজ নাটকে অমরেন্দ্রনাথ হরিরাজের ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং এই এক ভূমিকার অভিনয় করিয়াই তাঁহার নাট্য প্রতিভা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে। তিনি যে একজন প্রতিভাবান্ প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা এ কথা এক বাক্যে সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছিল। অমরেন্দ্রনাথের ক্লাসিক থিয়েটারে গিরিশচন্দ্রের হারানিধি প্রথম

---

† হরিরাজ নাটক সেক্সপীয়রের ম্যাক্‌বেথ ও হ্যামলেটের সংমিশ্রণে সংযোজিত। নাটকখানি সম্পূর্ণ নাট্যসম্পৎ-পূর্ণ, সুতরাং অমরেন্দ্র বাবুর ন্যায় অপরিপক্ক-বুদ্ধি নবীন লেখক দ্বারা বিরচিত বলিয়া বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। হরিরাজ নাটকই অমরেন্দ্রবাবুর শ্রেষ্ঠ নাটক। ইহার রচনায় অমরেন্দ্রনাথের নাট্য-প্রতিভা ও হরিরাজ চরিতের অভিনয়ে তাঁহার অভিনয় প্রতিভা পূর্ণ প্রকটিত।

অভিনীত হয়, না হরিরাজ নাটক প্রথম অভিনীত হয়, এ বিষয় লইয়া মতভেদ আছে। শ্রীযুক্ত মতীন্দ্রনাথ সরকার নাট্যমন্দিরে লিখিয়াছেন,—

"নাট্যরথী অমরেন্দ্রনাথের নাট্য-জীবনের উন্মেষ—নটগুরু গিরিশচন্দ্রের "হারানিধি" নাটকের অঘোরের চরিত্রে, বিকাশ—হরিরাজে এবং সমাপ্তি—সওদাগরের কুলীরকে। হারানিধি নাটকে "অঘোরের" ভূমিকা নিখুঁতভাবে অভিনয় করিয়া অমরেন্দ্রনাথ উৎকৃষ্ট অভিনেতা বলিয়া গণ্য হইলেন। তাহার পর হরিরাজের ভূমিকা অভিনয় করিয়া বঙ্গীয় নাট্য জগতের অভিনয় বন্যার একটা নূতন স্রোত ফিরাইয়া দিলেন—অমরেন্দ্রনাথের হরিরাজের চমকপ্রদ অভিনয় দেখিয়া সমগ্র বঙ্গদেশ চমকিত হইল।"

অমরেন্দ্রনাথ 'পলাশীর যুদ্ধের' অভিনয়ে দর্শক অভাব দেখিয়া, তাড়াতাড়ি হরিরাজ নাটক রচনা করিয়া মহাসমারোহে অভিনয় করিলেন। কিন্তু তাহাতেও তেমন দর্শকের সুবিধা হইল না। এখনকার মত তখনকার দিনে দর্শক এত সস্তা ছিল না। অধিকাংশ লোকেই নাট্যশালা ঘৃণার চক্ষে দেখিতেন। যে অল্প সংখ্যক লোক থিয়েটার দেখিতে যাইতেন, তাহারাও অনেক দেখিয়া শুনিয়া তবে থিয়েটারে যাইতেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন হাতীবাগানে ষ্টার থিয়েটার সদর্পে চলিতেছিল। সেই সময় যাঁহারাই পয়সা খরচ করিয়া অভিনয় দেখিতে যাইতেন

তাঁহারাই ষ্টার থিয়েটারে যাইতেন। কাজেই অমরেন্দ্রনাথের নূতন থিয়েটারে হরিরাজ নাটকের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় হইলেও দর্শকগণ নূতন থিয়েটার বলিয়া কেহই আসিতে চাহিতেন না। একেবারে দর্শকশূন্য রঙ্গালয়ে অভিনয় কার্য্য একরূপ সম্ভবপর নহে, কাজেই কি করিয়া দর্শক সংগ্রহ করা যায় অমরেন্দ্রনাথের তখন তাহাই হইল সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চিন্তা। কি করিলে তাঁহার থিয়েটারে দর্শক অভাব দূর হইবে দিনরাত তিনি তখন কেবল তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। জনশ্রুতি আছে, এই সময় এক একদিন ক্লাসিক থিয়েটারে এমনই দর্শকের অভাব হইত যে পথ হইতে লোক ডাকিয়া আনিতে হইত। সুবিখ্যাত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম, এ, মহাশয়ের নিকট হইতে আমরা শুনিয়াছি, যে এই সময় "ক্লাসিক" থিয়েটারের কোন কোন অভিনেতার প্রধান কার্য্যই ছিল থিয়েটারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া পথবাহী ভদ্রলোকগণকে 'কাকুতি মিনতি' করিয়া ধরিয়া আনিয়া অভিনয় দেখান। মন্মথবাবুকেও নাকি একদিন এই সকল অভিনেতার হস্তে পড়িতে হইয়াছিল এবং তাহাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে তাঁহাকেও বাধ্য হইয়া থিয়েটারে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল। এইভাবে দর্শক জোগাড় করিবার ভিতরেও অমরেন্দ্রনাথের যে একটা নিগূঢ় উদ্দেশ্য ছিল না তাহা নহে। তিনি ভাবিতেন এই ভাবে দর্শক হইয়াও, তাহাদের মুখে মুখে যদি তাঁহার থিয়েটারের সুখ্যাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়ে, তাহা হইলেও ভবিষ্যতে এমন একদিন আসিবে যখন তাঁহার

থিয়েটারে আর দর্শকের অভাব হইবে না। থিয়েটারের 'নেষা' বড় প্রচণ্ড। যে কখনও থিয়েটার দেখে নাই, তাহার কোন দিনই থিয়েটার দেখিবার আগ্রহ হইবে না। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি আবার কোন দিন কোন ক্রমে একবার অভিনয় দেখিতে পায় তাহা হইলে তাহার অভিনয় দেখিবার আগ্রহ এমনই বলবান হইয়া উঠিবে যে সে আর কিছুতেই অভিনয় না দেখিয়া থাকিতে পারিবে না। মন্মথবাবু বলেন, 'সেই যে একদিন আমি পীড়াপীড়িতে পড়িয়া থিয়েটার দেখিয়া আসিলাম তাহার পর আর আমি কিছুতেই অভিনয় দেখিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিতাম না। যখনই একটু সুবিধা পাইতাম তখনই থিয়েটার দেখিতে যাইতাম। এইভাবে থিয়েটার দেখার নেষাটা আমার বাড়িয়া গিয়াছিল। সেই যে আমার ঠিক সর্ব্বপ্রথম থিয়েটার সন্দর্শন তাহা নহে, নাট্যানুশীলন ও অভিনয় দর্শনে তাহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই আমার প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। তবে সেই দিন হইতে আমার দর্শনস্পৃহা বাড়িয়া গেল।'

অভিনয়মাধুরীতে দর্শকসংখ্যা সংবর্দ্ধন বিষয়ে অমরেন্দ্রনাথ স্থির করিলেন যে, এইবার একখানা গীতি নাটক (অপেরা) অভিনয় করিয়া দেখিবেন, তাহাতে দর্শক সংখ্যা বর্দ্ধিত হয় কি না। তিনি এক খানি ভালো গীতিনাট্যের সন্ধান করিতে লাগিলেন। থিয়েটার লইয়া তখন তিনি এমনই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, নিজে যে লিখিবেন এমন অবকাশ তাঁহার আদৌ ছিল না, অথচ একখানি

গীতিনাট্যের নিতান্ত প্রয়োজন। হরিরাজের সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর অভিনয় হওয়া সত্ত্বেও দর্শক হয় নাই, এ অবস্থায় তিনি আর নাটক অভিনয় করিতে সাহস করিতেছিলেন না। কিন্তু তখন থিয়েটারে দর্শকের অভাব এমনই হইয়াছিল যে যাহা হউক একখানা কিছু নূতন পুস্তক আর না হইলেই নয়, অথচ তখন সুবিধা মত গীতিনাট্য হাতে নাই। কাজে কাজেই অমরেন্দ্রনাথকে বাধ্য হইয়া আবার গিরিশচন্দ্রের "হারানিধি" নাটকের অভিনয় করিতে হইল। "হারানিধি" নাটকে অমরেন্দ্রনাথ অঘোরের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন। এই ভূমিকাটী তিনি এরূপ সুন্দর ও স্বাভাবিক অভিনয় করিয়াছিলেন যে, উহা যিনি দেখিয়াছেন তিনি কোন দিন তাহা ভুলিতে পারিবেন না। "অন্ধ নাচার বাবা" ও "মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক্"—এই দুইটী উক্তি তিনি এমন ভাবে আবৃত্তি করিতেন যে মনে হইত সত্যই বুঝি একজন অন্ধ নাচার আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়াছে। আমরা অমরেন্দ্রনাথের "হারানিধি" নাটকে অঘোরের ভূমিকা দেখিয়াছি। সে অভিনয় আজিও আমাদের প্রাণের ভিতর একটা চিরস্থায়ী দাগ টানিয়া দিয়া কাণের ভিতর ঝঙ্কার দিতেছে। যাঁহারা "হারানিধি"তে অমরেন্দ্রনাথের অঘোরের ভূমিকা দেখিয়াছেন তাঁহাদের সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইয়াছে অমরেন্দ্রনাথ সত্যই একজন প্রতিভাবান্ শ্রেষ্ঠ অভিনেতা।

কেবল অমরেন্দ্রনাথের উপরই 'জন্ম-অভিনেতা' এই আখ্যাটি প্রয়োজ্য। কেননা আমাদের দেশে যাঁহারাই অভিনয় করিয়াছেন

(অর্থাৎ অন্য যে সকল অভিনেতা ও অভিনেত্রী রঙ্গালয়ে অভিনয় করিয়াছেন,) বা করিতেছেন, তাঁহাদের সকলেরই একজন না একজন অভিনয়-গুরু ছিলেন অর্থাৎ অভিনয় বিদ্যা তাঁহারা একজন না একজনের নিকট শিখিয়াছেন। অমরেন্দ্রনাথের কেহ গুরু ছিল না। তাঁহার সংস্কার জন্মগত,—প্রাক্তনার্জ্জিত ভগবদ্দত্ত তাঁহার যে প্রতিভা ছিল তাহা আপনিই বিকশিত হইয়া পড়িয়াছিল।

হারানিধি নাটকে অমরেন্দ্রনাথ অঘোরের ভূমিকায় একটী সম্পূর্ণ প্রাণস্পর্শী নূতন ছবি দেখাইলেও দর্শক তেমন জুটিল না। আমাদের মনে হয় তাহার একমাত্র কারণ ক্লাসিক থিয়েটারে "হারানিধি" অভিনয় হইবার বহু পূর্ব্বে "হারানিধি" নাটক ষ্টার থিয়েটারে অনেকবার অভিনয় হইয়া গিয়াছে। ষ্টার থিয়েটারে "হারানিধি" নাটকে অঘোরের ভূমিকা Captain Bell (বেলবাবু) গ্রহণ করিয়াছিলেন। বেলবাবুর ন্যায় অভিনেতা অতি অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি অঘোরের ভূমিকা অভিনয় করিয়া উক্ত ভূমিকাটি একরূপ জ্বালাইয়াই দিয়াছিলেন। অন্য অভিনেতা সে ভূমিকা গ্রহণ করিতেই সাহস করিত না। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ সেই ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন। এই অঘোরের ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথ ও বেলবাবুর মধ্যে কাহার অভিনয় শ্রেষ্ঠ হইয়াছিল এ কথা বলা বড় কঠিন। এ সম্বন্ধে অমরেন্দ্রনাথের বাল্যবন্ধু শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় লিখিয়াছেন,—"ষ্টার থিয়েটারে যখন প্রথম "হারানিধি" খোলা হয়

"হরিরাজে," হরিরাজের ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথ।

তখন বেল দাদা (Captain Bell) অঘোরের ভূমিকা অভিনয় করিতেন। তেমন স্বাভাবিক অভিনয় বোধ হয় আর কখনও দেখি নাই। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ এই অঘোরের ভূমিকায় যে সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বর্ণনাতীত এবং সর্ব্বজন বিদিত। আমার বিশ্বাস Captain Bell ও অমরেন্দ্রনাথ অঘোরের ভূমিকাভিনয়ে কেহই উনিশ বিশ ছিলেন না। কি সুন্দর জীবন্ত ছবি! আমি জীবনে তাহা ভুলিব না।”

যাহা হউক হারানিধি দাঁড়াইল না। একটা রঙ্গালয় চালাইতে হইলে প্রত্যহই টাকার প্রয়োজন। এ অবস্থায় যদি বই না দাঁড়ায় তাহা হইলে সত্বাধিকারীকে বিশেষ বিপদ্‌গ্রস্ত হইতে হয়। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অমরেন্দ্রনাথ যখন ক্লাসিক থিয়েটার ভাড়া লইয়াছিলেন তখন তাঁহার হস্তে একটী পয়সাও ছিল না। তিনি ভাবিয়াছিলেন যে থিয়েটার খুলিলেই পয়সার সচ্ছল হইবে। থিয়েটার খোলা হইল, অথচ দর্শক নাই। পয়সার আমদানী নাই, অথচ প্রতিদিনই পয়সার প্রয়োজন। অমরেন্দ্রনাথ মহাচিন্তিত হইয়া পড়িলেন। আর এক দিনও সময় নষ্ট করা যায় না। এখন যেমন করিয়াই হউক যত শীঘ্র সম্ভব একখানা নূতন পুস্তক খুলিতেই হইবে, কেন না সত্বর কিছু টাকা না হইলে তিনি আর থিয়েটার কিছুতেই রাখিতে পারেন না। এখন নূতন পুস্তক পাওয়া যায় কোথায়? সে সময় নানা ঝঞ্ঝাটে তাঁহার মনের এমন অবস্থা হইল যে নিজে যে কোন পুস্তক

লিখিবেন তাহারও উপায় ছিল না। দুই একখানা নূতন নাটক তাঁহার হাতে আসিয়া পড়িতে লাগিল, কিন্তু নাটক খুলিতে কেমন যেন তাঁহার মন সরিতেছিল না, কাজেই তিনি তানানা করিয়া সময় কাটাইয়া দিতেছিলেন। বিধিলিপি খণ্ডন হইবার নয়। বিধাতাপুরুষ স্থতিকাগারে যাহার ভাগ্যে যাহা লিখিয়াছেন তাহা শত প্রলয়েও ওলোট পালট হইবার নয়। অভিনয় কলার একটা নূতন দিকে আলো দিবার জন্যই অমরেন্দ্রনাথের আজন্ম কামনা—তাঁহার প্রাণের বাসনা কি কখন অসম্পূর্ণ থাকিতে পারে! "যাদৃশী সাধনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"। দৈবক্রমে ঠিক সেই সময় শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, মহাশয় "আলিবাবা" নামক একখানি অপেরা লিখিয়া শেষ করিয়াছিলেন। লোক পরম্পরায় এ কথা অমরেন্দ্রনাথের কাণে আসিল। ক্ষীরোদ বাবুর অপেরা খানির কথা শুনিবামাত্র অমরেন্দ্র-নাথ সেই পুস্তকখানি ক্ষীরোদ বাবুর নিকট হইতে লইয়া আসিলেন এবং উহা ছাটিয়া কাটিয়া বাড়াইয়া সম্পূর্ণ অভিনয়োপযোগী করিয়া লইয়া মহালা আরম্ভ করিয়া দিলেন। মহোৎসাহে মহালা চলিতে লাগিল। অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার সম্প্রদায়ের সমস্ত লোককেই বলিয়া দিলেন যে "আগামী শনিবারে এই অপেরাখানা খোলা চাই। এই অল্প সময়ের মধ্যেই যাহাতে সকলে প্রস্তুত হইতে পারে সে বিষয়ের উপর সকলেরই যেন বিশেষ লক্ষ্য থাকে। আগামী শনিবারে প্রথম অভিনয় হইবে।" কাজেই আহার নিদ্রা বন্ধ করিয়া কেবলই দিন রাত উহার মহালা

চলিতে লাগিল। সেই সময় অমরেন্দ্রনাথ যখনই থিয়েটারে আসিতেন তখনই দেখিতেন, কেবলই সখীদিগের নাচ ও গান চলিতেছে। পরের কষ্ট অমরেন্দ্রনাথ আদৌ দেখিতে পারিতেন না,—পরের কষ্ট দেখিলেই তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। সখীগণের এই নিদারুণ পরিশ্রম দেখিয়া তিনি মহাবিচলিত হইয়া উঠিলেন। তখনই তাঁহার সম্প্রদায়ের অপেরা মাষ্টারকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যখনই থিয়েটারে আসি, দেখি এরা সবাই নাচিতেছে,—ব্যাপার কি! এরা কি বাড়ী টাড়ী যায় না?"

অপেরা মাষ্টার উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে আগামী শনিবার আলিবাবা খুলিতে হইবে,—এ সময় যদি এরা বাড়ী যায় তাহা হইলে কি আর নূতন বই শনিবারে খোলা যাবে?"

অপেরা মাষ্টারের কথায় অমরেন্দ্রনাথ অবাক্ হইয়া গেলেন,—বেশ একটু বিচলিত স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এরা খেলে কি?"

অপেরা মাষ্টার অপ্রস্তুতভাবে আবার উত্তর দিলেন, "বাজার থেকে জল টল খাবার আনিয়ে দেওয়া হয়েছে,—তাই সবাই খেয়েছে।"

এই সকল ক্ষুদ্র, সুকুমার বালিকাদের উপর এরূপ অত্যাচার অমরেন্দ্রনাথ সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনি অমনি অপেরা মাষ্টারকে বলিলেন, "এখনই উহাদিগকে ছাড়িয়া দাও। শুধু বাজারের জলখাবার খাইয়া মানুষে কখনও এত পরিশ্রম করিতে পারে!

কালি হইতে সবাই যেন আহারান্তে আসিয়া রিহার্স্যাল দেয়। এমন করিয়া অনাহারে রিহার্স্যাল দিবার কোন প্রয়োজন নাই,— তাতে বই শনিবারে অভিনয় হউক আর নাই হউক্।”

এ কথা সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করেন যে অমরেন্দ্রনাথ গরীবের মা বাপ ছিলেন। কাহারও উপর কেহ যে উৎপীড়ন করে, বা তাঁহার জন্য যে কেহ উৎপীড়িত হয়, তাহা তিনি একেবারেই পছন্দ করিতেন না। উপরি লিখিত ঘটনাটী হইতে আমাদের পাঠক পাঠিকাগণ অনায়াসেই তাহা উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

৺রায় বৈকুণ্ঠ নাথ বসু বাহাদুর বলেন, উপরিলিখিত ঘটনাটি আলিবাবার মহালার সময় হয় নাই, অমরেন্দ্রনাথের স্বরচিত একখানি কৌতুক নাট্যের মহালা হইবার সময় ঘটে। এ সম্বন্ধে তিনি যাহা লিখিয়াছেন তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

“যখন ক্লাসিক থিয়েটার জমিতেছিল, সেই সময় এক রবিবার রাত্রে তিনি নৃত্য শিক্ষক ও সঙ্গীত শিক্ষককে বলেন যে, আমি আজ যে কৌতুক নাটকখানি লিখিয়া শেষ করিয়াছি,—আগামী ১লা সোমবার দিনের বেলা হইতে তাহার রিহার্স্যাল আরম্ভ করিয়া পরবর্ত্তী শনিবারেই তাহার অভিনয় করিতে হইবে। তাঁহারা তাহাই হইবে বলিয়া স্বীকৃত হইলেন। সোমবার বেলা তিনটার সময় অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটারে আসিয়া দেখিলেন, নূতন নাটকের নাচ গান শিক্ষা চলিতেছে, কার্য্যান্তরে চলিয়া গিয়া, সন্ধ্যার সময়

যখন ফিরিয়া আসিলেন, তখনও দেখেন নাচ গান চলিতেছে। নৃত্য শিক্ষককে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "বেলা তিনটা পর্য্যন্ত বালিকারা কাজ করিতেছে দেখিয়া গিয়াছিলাম, ইহার মধ্যেই আবার উহাদিগকে আনাইয়াছ ?"

নৃত্যশিক্ষক উত্তর দিলেন, "উহাদিগকে আদৌ ছাড়িয়া দেওয়া হয় নাই।"

অমরেন্দ্রনাথ জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহাদের আহারাদির কি ব্যবস্থা হইয়াছিল ?"

উত্তরে শুনিলেন, "বাজার হইতে মিষ্টান্নাদি আনাইয়া দেওয়া হইয়াছে।"

অমরেন্দ্রনাথ বিরক্তির স্বরে কহিলেন, "কি! ইহারা পরশু ও গতকল্য সমস্ত রাত্রি অভিনয় করিয়াছে। এখনও ইহাদের পেটে অন্ন পড়িল না! এখনই ইহাদের ছাড়িয়া দাও; আর বলিয়া দাও কালি হইতে ভাত খাইয়া বেলা দুইটার সময় আসে।"

নৃত্যশিক্ষক কহিলেন, "তাহা হইলে আগামী শনিবারে নূতন পুস্তক অভিনয় করা অসম্ভব।"

অমরেন্দ্রনাথ কহিলেন, "অভিনয় না হয় আর এক কি দুই সপ্তাহ পিছাইয়া যাইবে। দুগ্ধপোষ্যা বালিকা বধ করিয়া আমি ব্যবসায় চালাইতে চাহি না।"

এই বলিয়া তিনি তৎক্ষণাৎ ঠিকা গাড়ী ডাকাইয়া বালিকাদিগকে

গৃহে পাঠাইয়া দিলেন। অনেক সময় বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে অভিনেতা বা কর্ম্মচারীকে কর্ম্মচ্যুত করিতে হইয়াছে, পরে তাহাদের কষ্টের কথা শুনিয়া স্বয়ং ডাকাইয়া আবার তাহাদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে বাহাল করিয়াছেন, এরূপ ঘটনা বিরল নহে।"

রীতিমত মহালা দিয়া যথাসময়ে অমরেন্দ্রনাথ "আলিবাবার" অভিনয় আরম্ভ করিয়া দিলেন। "আলিবাবা"য় অমরেন্দ্রনাথ হোসেনের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত বাবু পূর্ণচন্দ্র ঘোষ আলিবাবা সাজিয়াছিলেন, পণ্ডিত শ্রীযুক্ত হরিভূষণ ভট্টাচার্য্য "কাসিমের" ভূমিকা লইয়াছিলেন, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু "আবদালা" ও শ্রীমতী কুসুমকুমারী মর্জ্জিনার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। "সাকিনার" ভূমিকা শ্রীমতী ভূষণকুমারীকে প্রদান করা হইয়াছিল। যে রাত্রে ক্লাসিকে আলিবাবার প্রথম অভিনয় হইয়াছিল, সে রাত্রে দর্শক অধিক না হইলেও মোটের উপর মন্দ হয় নাই। অভিনয়ও হইয়াছিল সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর। অমরেন্দ্রনাথ হোসেন সাজিয়া একটা নূতন ছবি দেখাইয়াছিলেন। আলিবাবার হোসেনের ভূমিকা নামমাত্র বলিলেই হয়, কিন্তু সেইটুকুর ভিতরই অমরেন্দ্রনাথের অভিনয়ে বেশ একটু বিশেষত্ব ছিল। আলিবাবার অভিনয় আজি পর্য্যন্ত সমস্ত থিয়েটারেই হইতেছে। বহু অভিনেতা পুনরায় এই হোসেনের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে, কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের মত তেমনটী কাহারও হয় নাই। যাঁহারা অমরেন্দ্রনাথের হোসেনের

ভূমিকার অভিনয় দেখিয়াছেন ও অন্যান্য অভিনেতার ঐ ভূমিকার অভিনয় দেখিয়াছেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই উপলব্ধি করিয়াছেন অমরেন্দ্র-নাথের কণ্ঠস্বরে ও সাত্ত্বিকতায় এক অদ্ভুত অভিনব অননুকরণীয় ভাব উদ্‌ভাসিত।

"আলিবাবা" অভিনয়ের প্রথম রাত্রে দর্শক সংখ্যা খুব অধিক না হইলেও এই অপেরার সুখ্যাতি অতি শীঘ্রই চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। আলিবাবা অভিনয়ের সুখ্যাতি হইবার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসিকের দর্শক সংখ্যা বাড়িতে আরম্ভ হইল। শেষে এমন হইল যে ক্লাসিকের ন্যায় অত বড় থিয়েটারেও দর্শকের স্থানাভাব হইতে আরম্ভ হইল। আলিবাবা অভিনয়ের প্রতি রাত্রেই বহু সংখ্যক দর্শক স্থানাভাবে নিরাশ হইয়া ফিরিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অমরেন্দ্র-নাথেরও ভাগ্য পরিবর্ত্তনের সূত্রপাত হইল। এক আলিবাবা অভিনয় করিয়া অমরেন্দ্রনাথ লক্ষ মুদ্রার অধিক লাভবান্ হইলেন। ক্লাসিকের মহাগৌরব চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িল। হাটে বাজারে সর্ব্বত্রই এক কথা—অমর দত্ত আর ক্লাসিক থিয়েটার। অমরেন্দ্রনাথ ক্লাসিকের ভিত্তি দৃঢ় করিবার জন্য সে সময় তাঁহার থিয়েটারে যেরূপ অভিনেতা ও অভিনেত্রীর সমাবেশ করিয়াছিলেন সেরূপ সমাবেশ আর কখনও কোন রঙ্গালয়ে হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। তখন ক্লাসিকে গিরিশচন্দ্র, মহেন্দ্রলাল, দানীবাবু, পণ্ডিত হরিভূষণ, অঘোর পাঠক, নৃপেন বসু, হীরালাল, অহীন্দ্র, সঙ্গীতাচার্য্য দেবকণ্ঠ বাগচী,

বংশীবাদক অমৃতলাল ঘোষ, হারমোনিয়াম শিক্ষক ভূতনাথ দাস, ষ্টেজ ম্যানেজার ধর্ম্মদাসসুর ও আশু পালিত, শ্রীমতী তিনকড়ি, শ্রীমতী তারাসুন্দরী, শ্রীমতী কুসুমকুমারী, শ্রীমতী প্রমদাসুন্দরী, শ্রীমতী সুশীলাবালা, শ্রীমতী ভুবনমোহিনী, শ্রীমতী রাণীসুন্দরী (বড়), শ্রীমতী ফিরোজবালা প্রভৃতি অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণ বিরাজমান।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে যখন প্লেগ কলিকাতায় দর্শন দেয় সেই সময় ক্লাসিক থিয়েটার মহা গৌরবে চলিতেছিল। প্লেগের আগমনে কলিকাতা-বাসিগণ মহাতঙ্কে দিশেহারা হইয়া পড়িয়াছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ সে সময়ে অনেককেই যথাসাধ্য সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সাহায্য পাইয়া অনেক দরিদ্র পরিবার সে সময় মহাবিপদের হস্ত হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিল। ইহার কিছু দিন পরে, যখন প্লেগের আতঙ্কটা একটু কমিয়াছে সেই সময়, গিরিশচন্দ্রের পাণ্ডবগৌরব নাটকের অভিনয় ক্লাসিক থিয়েটারে মহাসমারোহে আরম্ভ হইল। "পাণ্ডব গৌরব" নাটকে অমরেন্দ্রনাথ ভীমের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। ঐ ভূমিকায়ও তিনি বিশেষ নাম পাইয়াছিলেন। "পাণ্ডব গৌরবের" ভীমের কথাটা মনে হইলেই আপনা হইতে অমরেন্দ্রনাথের কথাই মনের ভিতর জাগিয়া উঠে।

১৮৯৯ খৃষ্টাব্দের ১৬ই মার্চ্চ, যখন পাণ্ডব গৌরবের অভিনয় ক্লাসিক থিয়েটারে পূর্ণোদ্যমে চলিতেছিল, তখন গিরিশচন্দ্র, ক্লাসিকের আশাতীত ধনাগম দেখিয়া, অমরেন্দ্রনাথকে বলেন, "আমার

জন্যই তোমার থিয়েটার এমন চলিয়াছে। আমি না থাকিলে, ক্লাসিক কথনও এমন গৌরবে পরিচালিত হইত না। সুতরাং তোমায় আমাকে লাভের একটা অংশ প্রদান করা উচিত, তাহা না হইলে আমি তোমার থিয়েটারে থাকিতে পারি না।” কিন্তু স্বাধীনচেতা অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন, “আপনি আমার থিয়েটারের শিরোরত্ন ; বস্তুতঃ বাঙ্গালার নাট্যজগতের কোহিনুর। আপনার পরিচালনায় এই সব অভিনেতৃকুলমণিদের প্রতিভারশ্মিতে আমার থিয়েটার আজি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছে, ইহাতে কিছুই সন্দেহ নাই। তবে আপনার অতিরিক্ত লভ্যাংশের দাবী করা ঠিক উচিত কি ? ব্যবসায়ের হিসাবে আবার দুর্দিন আসা কতক্ষণ ? তখন কি করিয়া চালাইব ? আমায় মাপ করিবেন, প্রাপ্য দেয়াতিরিক্ত লাভের অংশ দেওয়া অসম্ভব।” সেই কথা শুনিয়া গিরিশচন্দ্র বেশ বিরক্তি অনুভব করিলেন, ইতি-পূর্ব্বে এরূপ কথা তিনি কখনও কাহারও নিকটে শুনেন নাই। তখন ২৪পরগণার অন্তর্গত শ্রীপুরের জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু নরেন্দ্রনাথ সরকার মিনার্ভা থিয়েটারের সত্বাধিকারী ছিলেন। তিনি কিছু টাকা রোক দেওয়ায় ক্লাসিক হইতে গিরিশচন্দ্র শ্রীমতী তিনকড়ি প্রভৃতিকে লইয়া মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করিলেন। গিরিশচন্দ্র যে দিন ক্লাসিক থিয়েটারপরিত্যাগ করেন, সে দিন দোল, কলিকাতার সর্ব্বত্র আবিরের ছড়াছড়ি চলিতেছিল।

গিরিশচন্দ্র সহসা মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করায় অমরেন্দ্র-

নাথ বিশেষ মনঃ-ক্ষুণ্ণ হইলেন। তাঁহার পার্শ্বচরগণ তাঁহাকে উত্তেজিত করিতে লাগিল, "গিরিশবাবুর এ কাজটা বড় অন্যায় হইয়াছে, আপনি তাঁর নামে নালিশ করুন।"

অমরেন্দ্রনাথ তখন অপরিণামদর্শী যুবক মাত্র। পার্শ্বচরগণের উত্তেজনায় উত্তেজিত হইয়া তিনি গিরিশচন্দ্রের নামে মামলা রুজু করিলেন। মামলা চলিতে লাগিল। দুই পক্ষের যে কিছু কিছু খরচ হইল না তাহা নহে। শেষ মামলায় অমরেন্দ্রনাথের পরাজয় হইল। গিরিশচন্দ্র মামলায় জয়লাভ করিয়া মিনার্ভার কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। গিরিশচন্দ্র ক্লাসিক থিয়েটার ছাড়িয়া দিলেন বটে, কিন্তু ক্লাসিকের গৌরব তাহাতে বিশেষ কিছুই ক্ষুন্ন হইল না। অমরেন্দ্রনাথের ক্লাসিক প্রায় সেইরূপ পূর্ব্ব গৌরবেই চলিতে লাগিল।

পঞ্চম উল্লাস।

—— * ——

অদৃষ্ট-লীলা।

গিরিশচন্দ্র মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের 'সীতারাম' নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া অভিনয় আরম্ভ করিলেন। অমরেন্দ্রনাথও রাত্রিমধ্যে সীতারাম নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া

সপ্তাহকাল মাত্র মহালার পর ক্লাসিকে অভিনয় করিতে লাগিলেন। মিনার্ভায় সীতারামের ভূমিকা গিরিশচন্দ্র স্বয়ং গ্রহণ করিলেন এবং ক্লাসিকে সীতারাম সাজিলেন স্বয়ং অমরেন্দ্রনাথ। গিরিশচন্দ্রের সহিত এই প্রতিযোগিতায় অমরেন্দ্রনাথ হাস্যাস্পদ হন নাই। অমরেন্দ্রনাথের সীতারামের ভূমিকার অভিনয় যে মন্দ হয় নাই এ কথা সকলকেই স্বীকার করিতে হইয়াছিল। এ বিষয়ে শ্রীযুক্ত মতীন্দ্রনাথ সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন,—

"ইহার পর গিরিশচন্দ্র 'সীতারাম' নাট্যাকারে পরিণত করিয়া অভিনয়ের ব্যবস্থা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথও সীতারাম নাটকাকারে পরিবর্তিত করিয়া ক্লাসিকে অভিনয় আরম্ভ করিলেন। তখন ক্লাসিকের হ্যাণ্ডবিলে সদর্পে বিজ্ঞাপিত হইয়াছিল, "ক্লাসিকের সীতারাম দৃপ্ত যুবা—স্থবির নহে।" মিনার্ভা থিয়েটারে সীতারাম স্বয়ং গিরিশচন্দ্র, ক্লাসিকে অমরেন্দ্রনাথ। গুরু শিষ্যে সমরের স্রোত চলিতে লাগিল। এই ভাবে কয়েক মাস অতীত হইল, তাহার পর গিরিশচন্দ্র আবার তিনকড়ি ও সুরেন্দ্রনাথকে লইয়া ক্লাসিকে যোগদান করিলেন। আবার ক্লাসিক অপ্রতিহত প্রতাপে রঙ্গ-লীলায় প্রবৃত্ত হইল।"

যখন ক্লাসিক থিয়েটারের যশোগৌরব শিখরদেশে উপনীত, সেই সময়, ১৩০৮ সালে, অমরেন্দ্রনাথ "রঙ্গালয়" নামে একখানি সাপ্তাহিক পত্র প্রকাশিত করিলেন। বঙ্গ রঙ্গালয়ের মুখপত্র হইয়া

"রঙ্গালয়" পত্রিকা প্রকাশিত হইল। "রঙ্গালয়" পত্র আইভরিফিনিস কাগজে মুদ্রিত হইত। রঙ্গালয় পত্রিকায় কাগজ, ছাপা, লেখা সমস্তই যতদূর সম্ভব উৎকৃষ্ট হইয়াছিল। অমরেন্দ্রনাথ শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়কে এই পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। রঙ্গালয় পত্রিকার সহিত ক্লাসিক থিয়েটারের অভিনীত নাটকাবলীর বিবিধ চিত্র আর্ট পেপারে মুদ্রিত হইয়া গ্রাহকগণকে উপহার প্রদান করা হইত। রঙ্গালয় পত্রিকার ব্যয় যে পরিমাণে হইতেছিল, তাহার মূল্য তদপেক্ষা অনেক কম ছিল। প্রতি খণ্ড দুই পয়সা মূল্যে বিক্রীত হইত, অথচ তাহাতে প্রায় ছয় পয়সা খরচ হইত, কাজেই ছয় বৎসর পত্রিকা বাহির করিবার পর অমরেন্দ্রনাথ এই পত্রিকাখানি বন্ধ করিয়া দিলেন। কেবল সাধারণের নাট্যানুরাগ বৃদ্ধি ও নাট্যশিল্পের উন্নতি বিধানের নিমিত্তই অমরেন্দ্রনাথ বহু ক্ষতি সহ্য করিয়াও প্রায় ছয় বৎসর ঐ পত্রিকা চালাইলেন ; কিন্তু যখন ক্ষতির পরিমাণ ষট্ সহস্র মুদ্রায় উঠিল, তখন অমরেন্দ্রনাথ বাধ্য হইয়া ঐ পত্রিকা বন্ধ করিয়া দিলেন। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। তিনি লিখিয়াছেন,—

"আমাদের কালু—ছেলে বেলা হইতে যাহাকে দেখিয়াছি,—প্রথম যৌবনে যাহাকে শাসনে রাখিবার চেষ্টা করিয়াছি,—পরে যাহার অধীনে চাকরী লইয়া রঙ্গালয় সম্পাদন করিয়াছি,—সেই

কেলো,—সেই অমর, চল্লিশ বছর হইতে না হইতেই চলিয়া গেল! বেতনভোগী কর্ম্মচারী হইয়া মনিবের উপর হুকুম চালাইবার অধিকার আমরা কেবল অমরেন্দ্রনাথের কাছেই পাইয়াছিলাম। তাহার অগ্রজের সখা বলিয়া অমরেন্দ্রনাথ আমাদিগকে ঠিক অগ্রজের ন্যায় ভয় করিত, ভক্তি করিত। * * * * থিয়েটারের কার্য্যে অমরেন্দ্রনাথ অনেক নূতন পদ্ধতির প্রবর্ত্তক। অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটারের মুখপত্র স্বরূপ একখানা সাপ্তাহিক কাগজ বাহির করিয়াছিল, বাঙ্গালা থিয়েটারের জন্য একটা 'লিটারেচর' সৃষ্টি করিবার আয়োজন করিয়াছিল। যে হিসাবে সোমপ্রকাশের ৺দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ও হিন্দু পেটরিয়টের ৺কৃষ্ণদাস পাল আমাদের স্মরণযোগ্য, সেই হিসাবে অমরেন্দ্রনাথ আমাদের স্মরণ-যোগ্য। * * * অমরেন্দ্রনাথ কলিকাতার রঙ্গমঞ্চের অনেক উন্নতি, অনেক পরিবর্ত্তন সাধন করিয়াছিল। সাজ পোষাক দৃশ্যে, নূতন অভিনয় ভঙ্গীতে, অমরেন্দ্র অনেক পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া অচিরেই দর্শকের চিত্ত বিনোদনের সুব্যবস্থা করিয়াছিল।"

পদস্থ রাজপুরুষগণকে দেশীয় নাট্যশালায় আনিবার অমরেন্দ্র-নাথই প্রথম পথ প্রদর্শক। তিনিই প্রথম বঙ্গেশ্বরকে ও হাই-কোর্টের প্রধান বিচারপতিকে তাঁহার থিয়েটারে আমন্ত্রিত করেন। বঙ্গেশ্বর প্রথম আসিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন,—কিন্তু থিয়েটার-বিদ্বেষী কয়েকজন লোকের আপত্তিতে তিনি থিয়েটারে আইসেন

নাই। কিন্তু মাননীয় হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি মহাশয় আসিয়াছিলেন। নাট্যশালা যে একটা ঘৃণার সামগ্রী নহে, কিন্তু সুকুমার ললিতকলাশিক্ষা মন্দির, অমরেন্দ্রনাথ নানাভাবে এইকথাই দেশবাসীকে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

১৯০০ খৃষ্টাব্দে শ্রীযুক্ত নরেন্দ্রনাথ সরকারের থিয়েটার নানা কারণে বন্ধ হইয়া গেলে অমরেন্দ্রনাথ, ১০ই মে, মাসিক পাঁচ শত টাকা হিসাবে উক্ত রঙ্গালয় সত্ত্বাধিকারী প্রিয়নাথ দাসের নিকট হইতে ভাড়া লইলেন এবং এক সঙ্গে দুই থিয়েটার চালাইবার জন্য দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেন। তিনি সর্ব্বশুদ্ধ ৭৫০৲ টাকা ব্যয় করিয়া মিনার্ভা থিয়েটার খুলিয়া দিলেন। ১৯০০ খৃষ্টাব্দের ৭ই নভেম্বর অমরেন্দ্রনাথ পরিচালিত মিনার্ভা থিয়েটারে রঘুবীর নাটক মহাসমারোহে অভিনীত হইল। রঘুবীর নাটকখানি শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ এম, এ, মহাশয়ের রচিত। এই নাটকে অমরেন্দ্রনাথ স্বয়ং রঘুবীরের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। রঘুবীর অভিনয় করিয়া অমরেন্দ্রনাথ রীতিমত সুখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। এই সময় প্রত্যেক বাঙ্গালীই অমরেন্দ্রনাথের নামের সহিত পরিচিত হইয়া উঠিয়াছিলেন।

মিনার্ভা থিয়েটার ভাড়া লইয়া অমরেন্দ্রনাথ শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস দে ও শ্রীযুক্ত মতীন্দ্রনাথ সরকার নামে দুইটী ভদ্র লোককে মিনার্ভা থিয়েটারের ভার অর্পণ করেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত দুর্গাদাস দের সহিত অধিক দিন অমরেন্দ্রনাথের সদ্ভাব রহিল না। কোন কারণ বশতঃ হঠাৎ

একদিন অমরেন্দ্রনাথের সহিত দুর্গাদাসের প্রকাণ্ড বিবাদ আরম্ভ হইল। খুলনার উকীল শ্রীযুক্ত বেণীভূষণ রায়ও মিনার্ভা থিয়েটারের তখন একজন মাতব্বর ছিলেন। তিনি দুর্গাদাস বাবুর পক্ষাবলম্বন করিতেন। অমরেন্দ্রনাথের স্বভাবটা ছিল একরোখা। তিনি জীবনে কখন কাহারও মতামত গ্রাহ্য করিতেন না। তিনি যাহা ভাল বুঝিতেন চিরকাল তাহাই করিয়া আসিয়াছেন। দুর্গাদাস বাবু ও বেণী বাবুর সহিত অমরেন্দ্রনাথের বিবাদ এমনই গুরুতর হইয়া দাঁড়াইল, যে অমরেন্দ্রনাথ পুলিশের সাহায্যে মিনার্ভার 'পজেসন' লইয়া, থিয়েটারের সমস্ত জিনিষপত্র মায় পোষাক পরিচ্ছদ পর্য্যন্ত ক্লাসিক থিয়েটারে লইয়া আসিলেন। এক সঙ্গে দুই থিয়েটার পরিচালনার ইচ্ছা এই এক ঘটনাতেই অমরেন্দ্রনাথের চিরকালের মত ব্যর্থ হইয়া গেল।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দে ২০শে জুলাই অমরেন্দ্রনাথ মিনার্ভার লিজ্ শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয়ের নামে পরিবর্ত্তন করিয়া দিলেন। মনোমোহন বাবু তাঁহার প্রিয় বন্ধু হাইকোর্টের সুবিখ্যাত উকিল অদ্ভুত নাট্যপ্রতিভাবান্ শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার মিত্র মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীযুক্ত বাবু চুণিলাল দেবকে তাঁহার থিয়েটারের ম্যানেজারের পদে বরণ করিলেন। চুণি বাবু মিনার্ভা থিয়েটারের ম্যানেজার হইয়া টিকিট বিক্রয় বাড়াইবার এক নূতন পন্থা আবিষ্কার করিলেন। মহেন্দ্রবাবুর উপদেশে তিনি বসুমতী পত্রিকার স্বত্বাধিকারী

অমরেন্দ্রনাথ

শ্রীযুক্ত বাবু উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের সহিত পরামর্শ করিয়া অভিনয়ের সহিত পুস্তক উপহার দিবার বন্দোবস্ত করিলেন। এই প্রথম থিয়েটারে উপহার বিতরণের প্রারম্ভ। উপহার পুস্তক গ্রহণের জন্য মিনার্ভায় লোকের হুড়াহুড়ি পড়িয়া গেল, কাজেকাজেই ক্লাসিকের বিক্রেয় কম পড়িতে লাগিল। অমরেন্দ্রনাথ তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না। তিনিও তাঁহার থিয়েটারে উপহার বিতরণের বন্দোবস্ত করিলেন। যে উপহার বিতরণে মিনার্ভার ভাগ্য ফিরিল, সেই উপহার বিতরণেই ক্লাসিকের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। অমরেন্দ্রনাথ চিরকালই অপব্যয়ী ছিলেন, তাহার উপর উপহার বিতরণ প্রভৃতি নানাকাণ্ডে প্রচুর অর্থ ব্যয় হইতে লাগিল। অমরেন্দ্রনাথকে এই সময় বাধ্য হইয়া দেউলিয়া খাতায় নাম লিখাইতে হয়। ক্লাসিক থিয়েটার হইতে ন্যূন পক্ষে অমরেন্দ্রনাথ প্রায় দশলক্ষ টাকা উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার এমনই অপব্যয় যে তথাপি তাঁহার দেড়লক্ষ টাকা তখন ঋণ। মহামান্য হাইকোর্টের বিচারে এই ঋণ পরিশোধ করিবার জন্য শ্রীযুক্ত বাবু অতুলচন্দ্র রায় মহাশয় ক্লাসিক থিয়েটারের রিসিভার নিযুক্ত হইলেন। কিন্তু স্বাধীন চেতা অমরেন্দ্রনাথ রিসিভারের বাঁধাবাঁধির ভিতর থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাঁহার বড় সাধের ক্লাসিক থিয়েটারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত বাবু মতীন্দ্রনাথ সরকার যাহা লিখিয়াছেন পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্য তাহা আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম,—

"হরিরাজে," হরিরাজের ভূমিকায় অমরেন্দ্রনাথ।

"মিনার্ভা থিয়েটার গ্রহণ করিয়া শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে স্বনামখ্যাত নাট্যকার ও অভিনেতা শ্রীযুক্ত চুণিলাল দেবকে ম্যানেজার নিযুক্ত করিলেন। চুণিবাবু তখন মিনার্ভার অন্যতম অংশিরূপেও আহূত হইয়াছিলেন। তখনও প্রবল প্রতাপে ক্লাসিক চলিতেছিল। ক্লাসিকের সহিত প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিবার সাধ্য বা সামর্থ্য তখন ক্ষুদ্র মিনার্ভার ছিল না। এখন থেস্‌পিয়ান টেম্পলের যে অবস্থা, মিনার্ভার অবস্থাও তখন সেই প্রকার ছিল। চুণিবাবু এই সময় মিনার্ভাকে প্রতিষ্ঠিত করিবার এক উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি সুপ্রসিদ্ধ বসুমতীর' সত্ত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সহিত পরামর্শ করিয়া মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনয়ের সহিত পুস্তক উপহার দিবার বন্দোবস্ত করিলেন। থিয়েটারে বসুমতীর পুস্তক উপহার বোধ হয় এই প্রথম। প্রথম উপহার মাইকেল মধুসূদন দত্তের গ্রন্থাবলী। এই ব্যবস্থার প্রথম দিন মিনার্ভায় লোকারণ্য হইল—যেখানে একশত দেড়শত টাকা বিক্রয় হইতেছিল, সেখানে দেড় সহস্র টাকার টিকিট বিক্রয় হইল। স্থানাভাবে কাতারে কাতারে লোক ফিরিয়া গেল। বিডনষ্ট্রীটে একটা তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হইল।

মিনার্ভায় নূতন নূতন বিক্রয়ের তোড়ে, ক্লাসিকের বিক্রয় যে কমিয়া গেল এ কথা বলাই বাহুল্য। অমরেন্দ্রনাথ অধীর হইয়া উঠিলেন। তিনিও উপহার দিবার বিরাট্ আয়োজন করিলেন। তিন গুণ অধিক মূল্য দিয়া তিন দিনের মধ্যে মাইকেল মধুসূদন দত্তের

গ্রন্থাবলী ছাপাইয়া উপহার দিবার ব্যবস্থা করিলেন। তখন কেবল উপহারের প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলিতে লাগিল। এই উপহারই ক্লাসিকের কাল হইল—এই উপহারের জন্যই অপরাজেয় ক্লাসিকের পতন হইল। নির্ব্বাণোন্মুখ মিনার্ভা উপহারের কল্যাণে যেমন শনৈঃ শনৈঃ শক্তি সঞ্চয় করিতে লাগিল, চলতি থিয়েটার ক্লাসিক পক্ষান্তরে উপহারের ধাক্কা সামলাইতে গিয়া তাহার অমূল্য ইজ্জত হারাইল,—ক্রমশঃ জনহীন হইয়া পড়িতে লাগিল। ফলতঃ উপহার ক্ষুদ্র মিনার্ভাকে উন্নত করিল এবং বিডনষ্ট্রীট কেশরী ক্লাসিককে বাগুরায় আবদ্ধ করিল।"

অমরেন্দ্রনাথের ক্লাসিক থিয়েটারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ করিবার সংবাদ অচিরে ঘরে ঘরে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। ইহারই মধ্যে অমরেন্দ্রনাথকে নাট্যামোদী সুধীবৃন্দ শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। তিনি সহসা থিয়েটারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক রহিত করিয়া দেওয়ায় সকলেই মনে মনে বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হইলেন।

কিন্তু ইহার কিছুদিন পরেই অর্থাৎ ১৯০৪ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি এক অপূর্ব্ব প্লাকার্ড সমস্ত কলিকাতার দেওয়ালে দেওয়ালে পড়িয়া সমস্ত কলিকাতাবাসীকে মহা বিচলিত করিয়া তুলিল। ব্যাপারটা পরিষ্কার ভাবে জানিবার জন্য সকলেই যেন একটু উৎসুক হইয়া পড়িল। সেই প্লাকার্ডে লেখা ছিল,—

"গ্র্যাণ্ড থিয়েটার !
রহ প্রতীক্ষায়—কবে ? কোথায় ?

ইহার কিছুদিন পরেই বড় প্লাকার্ডে গ্র্যাণ্ড থিয়েটারের বিস্তৃত ব্যাপার বাহির হইল। কলিকাতাবাসীরাও হাফ ছাড়িয়া বাঁচিল। লোকে দেখিল অমরেন্দ্রনাথ হ্যারিসন রোডের কর্জ্জন থিয়েটার ভাড়া করিয়া নব কলেবরে আবার নূতন থিয়েটার খুলিতেছেন।

১৯০৪ খৃষ্টাব্দের ২২শে বৈশাখে শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন গোস্বামী প্রণীত পৃথ্বীরাজ নাটক লইয়া অমরেন্দ্রনাথ গ্র্যাণ্ড থিয়েটারের দরজা খুলিলেন। অমরেন্দ্রনাথ যখন ক্লাসিক থিয়েটার ছাড়িয়া গ্র্যাণ্ড থিয়েটার খুলিলেন তখন শ্রীযুক্ত চূণিলাল দেব, শ্রীযুক্ত নৃপেন্দ্রচন্দ্র বসু, শ্রীমতী কুসুমকুমারী ব্যতীত আর কোন নাম করা অভিনেতা ও অভিনেত্রী তাঁহার থিয়েটারে ছিলেন না। "পৃথ্বীরাজ" নাটক ও "ঘুঘু" প্যাণ্টোমাইন মহাসমারোহে অভিনীত হইল। অভিনয়ও অতি উচ্চ অঙ্গের হইয়াছিল। অমরেন্দ্রনাথ স্বয়ং পৃথ্বীরাজের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলে কি হইবে, মানুষের যখন সময় খারাপ পড়ে তখন কিছুতেই কিছু হয় না। এত সমারোহে এত বিজ্ঞাপন করিয়া অমরেন্দ্রনাথ গ্র্যাণ্ড থিয়েটার

খুলিলেন বটে, কিন্তু প্রথম রাত্রে দর্শক তেমন হইল না। প্রথম রাত্রেই দর্শক ভাল না হওয়ায় অমরেন্দ্রনাথ বেশ একটু বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি পৃথ্বীরাজ নাটকখানি মুদ্রিত করিয়া থিয়েটারের অভিনয়ের সহিত বিতরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাহাতেও দর্শক সংখ্যা বিশেষ বাড়িল না। তখন তিনি আবার "বসুমতী"র সহিত বন্দোবস্ত করিয়া গ্র্যাণ্ড থিয়েটারে উপহারের ছড়াছড়ি আরম্ভ করিয়া দিলেন। এই উপহার বিতরণের ঘটায় যখন সবে কেবল গ্র্যাণ্ড থিয়েটারের দর্শক সংখ্যা বৃদ্ধি পাইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই সময় ক্লাসিক থিয়েটারের রিসিভার শ্রীযুক্ত বাবু অতুলচন্দ্র রায় ক্লাসিক থিয়েটার চালাইতে অক্ষম হইয়া অমরেন্দ্র-নাথকে ধরিয়া পড়িলেন। অমরেন্দ্রনাথ তখনও ক্লাসিক থিয়েটারের মায়া ত্যাগ করিতে পারেন নাই, তাহার উপর আবার অতুল বাবুর জেদাজেদি; কাজেই তাহাকে আবার ক্লাসিক থিয়েটারে আসিতে হইল। তিনি মাসিক ৫০০৲ শত টাকা বেতনে ক্লাসিক থিয়েটারের ম্যানেজারের পদ গ্রহণ করিলেন। এই তাঁহার থিয়েটারে প্রথম বেতন গ্রহণ। ক্লাসিক থিয়েটারে যোগদান করিয়া অমরেন্দ্রনাথ স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের "প্রণয়-পরিণাম" নামক উপন্যাস খানি নাটকাকারে পরিণত করিয়া "প্রণয়—না—বিষ" নামে অভিনীত করিলেন। উহাতে অমরেন্দ্রনাথ "রমা" পাগ্‌লার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ভূমিকাটীতে অমরেন্দ্রনাথ এমন একটা

বৈচিত্র দেখাইয়াছিলেন, যে সাধারণ অভিনেতার নিকট হইতে সেরূপ উচ্চাঙ্গের অভিনয় কখনও কোন দেশে আশা করা যায় না।

অমরেন্দ্রনাথ ম্যানেজার হইয়া আবার ক্লাসিকে আসিলেন বটে, কিন্তু ক্লাসিকের ভাগ্য আর পরিবর্ত্তিত হইল না। উহার প্রধান কারণ তখন শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে, হাইকোর্টের সুবিখ্যাত উকিল শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রকুমার মিত্র, এম, এ, বি, এল মহাশয়ের সাহায্যে, প্রকাশ্য নীলামে ষাট হাজার টাকায় মিনার্ভা থিয়েটার খরিদ করিয়া মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনেতা ও অভিনেত্রীর একটা বিরাট সমাবেশ করিয়া দিয়াছিলেন। এই সমাবেশ সম্বন্ধে মতীন্দ্র বাবু লিখিয়াছেন,—

"কিন্তু সেই সময় ভাগ্যবান্ মনোমোহন পাঁড়ে, বিচক্ষণ উকিল মহেন্দ্রকুমার মিত্রের সহায়তায়, ষাট হাজার টাকায় মিনার্ভা থিয়েটার ক্রয় করিয়া অষ্টবজ্র সম্মিলন করিয়াছেন—গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর, দানী, নীলমাধব চক্রবর্ত্তী, তারাসুন্দরী, তিনকড়ি, সুশীলাবালা প্রভৃতি অভিনেতৃবর্গের সমাবেশ হইয়াছে।"

ক্লাসিক থিয়েটারে সুবিধা করিতে না পারিয়া অমরেন্দ্রনাথ আবার গ্র্যাণ্ড থিয়েটারে যোগ দান করিলেন। কিন্তু তখন দিবারাত্র পরিশ্রমে ও দুশ্চিন্তায় তাঁহার স্বাস্থ্য একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইলেন। সঙ্গে সঙ্গে গ্র্যাণ্ড থিয়েটারেরও সঞ্চালন-শক্তি বিনষ্ট হইয়া

পড়িল,—তাহার বাহিনী একেবারে ছত্রভঙ্গ হইয়া চারিদিকে ছড়াইয়া গেল।

ক্লাসিক থিয়েটার খুলিবার পর অমরেন্দ্রনাথ তথায় নানা নাটকে নানা ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার ভিতর তাঁহার হরিরাজ নাটকে "হরিরাজ", হারানিধি নাটকে "অঘোর", আলিবাবায় "হোসেন", প্রফুল্লে "ভজহরি", পাণ্ডব গৌরবে "ভীম", ও ভ্রমরে "গোবিন্দলালের" ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপরি লিখিত ভূমিকাগুলির অনেকগুলিই তাঁহার পূর্ব্বে ও পরে বহু অভিনেতা বহুবার অভিনয় করিয়াছেন, কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ যেমনটী করিয়াছিলেন তেমনটী হইয়াছে বলিয়া আমাদের মনে হয় না। উপরি লিখিত ভূমিকা গুলিতে তিনি যে সকল বৈচিত্র দেখাইয়াছেন তাহা দেখান অন্য অভিনেতার সাধ্যের বাহিরে! অমরেন্দ্রনাথ যখন ভ্রমরে "গোবিন্দ-লালের" ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতেন, তখন দর্শকগণের প্রাণের ভিতর যেন একটা নূতন হর্ষ জাগিয়া উঠিত। বঙ্কিমচন্দ্রের কল্পিত গোবিন্দলাল, মনে হইত, যেন সজীব হইয়া সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। এত সুন্দর, এত স্বাভাবিক, এত মধুর অভিনয় যে হইতে পারে তাহা লোকের ধারণার অতীত। যে দৃশ্যে গোবিন্দলাল রোহিণীকে গুলি করে, সেই সময় গোবিন্দলাল-রূপী অমরেন্দ্রনাথের যে মুখ চোখের ভঙ্গী হইত তাহা যিনি দেখিয়া-ছেন তিনিই জানেন কত স্বাভাবিক, কত সুন্দর। তাঁহার অভিনয়

যিনি দেখিয়াছেন তাঁহাকেই স্বীকার করিতে হইবে যে অমরেন্দ্রনাথ ভগবান্ প্রদত্ত একটা অসীম প্রতিভা লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি অমরেন্দ্রনাথ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়াছিলেন। এই রোগ এমন সাঙ্ঘাতিক ভাব ধারণ করিল যে তাঁহার আর জীবনের আশা রহিল না। কেবল তাঁহার সাধ্বী পত্নীর প্রাণপণ শুশ্রূষায় তিনি আবার জীবন ফিরিয়া পাইলেন। সাধ্বী পতিপ্রাণা যমের সহিত যুদ্ধ করিয়া পতিকে মৃত্যুমুখ হইতে ফিরাইয়া আনিলেন। অমরেন্দ্রনাথ রোগমুক্ত হইয়া পশ্চিমে হাওয়া পরিবর্ত্তন করিতে গমন করিলেন। পশ্চিমে কয়েক মাস থাকিয়া তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ ও সবল হইয়া কলিকাতায় ফিরিলেন। কলিকাতায় ফিরিয়া তিনি তাঁহার পত্নী ও একমাত্র পুত্রকে লইয়া সংসারী হইলেন। পত্নীর যত্নে ও শুশ্রূষায় তিনি যে প্রাণ পাইয়াছিলেন সে কথা অমরেন্দ্রনাথ একটী কবিতায় নিজেই লিখিয়া গিয়াছেন। আমাদের পাঠক পাঠিকার অবগতির জন্য সেই কবিতার কয়েকটী বিহ্বলতা পূর্ণ কলিকা নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম,—

(১)

"শ্রান্ত ক্লান্ত, অবিশ্রান্ত ব্যাধির তাড়নে,—
শয্যা সনে দেহ যষ্টি লীন !
হয় মনে প্রতিক্ষণে—কাল হুতাশনে
হয় বুঝি হয় বা বিলীন !

মিটি মিটি গৃহ কোণে, জ্বলে দীপ সকরুণে,
প্রেতকায়া সম ছায়া—নেচে নেচে ওঠে।
সন্ধ্যার গাম্ভীর্য্য তাহে আর(ও) যেন ফোটে॥

(২)

হতভাগ্য যুবা ওই,—বিধির বিধানে—
ঐশ্বর্য্যের ছিল অধিকারী।
শত শত চাটুকার স্তুতিবাদ গানে—
জনে জনে দিত বলিহারী !!
ছিল বারনারী রত, মদ্যপান অবিরত,
দিবা নিশি আনন্দের উচ্চ কোলাহল,
মুখরিত রাখিত সে রম্য হর্ম্ম্যতল !!

(৩)

গিয়াছে সেদিন—মাত্র আছে কল্পনায়,
এবে যুবা কপর্দ্দক-হীন !
জীর্ণ গৃহে শীর্ণ দেহে শয়িত শয্যায়,
সমাগত সমাধির দিন !!
পাত্র মিত্র আত্মজন, করিয়াছে পলায়ন,—
মর্ম্মভেদী দীর্ঘশ্বাস দিগন্তে প্রসারি,
কহে যুবা—'বড় তৃষা—এক বিন্দু বারি॥'

(৪)

আর্দ্র বস্ত্রে ত্রস্তপদে কে তুমি সুন্দরী,
সন্ধ্যার আঁধার লয়ে বুকে !
বারিপাত্র লয়ে করে—আহা মরি মরি,
পশ' গৃহে—ধীরে অধোমুখে !
কে গো তুমি কমলিনী, মূর্ত্তিমতী বিষাদিনী,
দিব্য কান্তি জ্যোতিহীন মলিন-বসনা,
স্বভাবে অভাবে যেন বিরাগে মগনা ॥

(৫)

চিনেছি চিনেছি তুমি পতিব্রতা সতী,
হিন্দুজাতি গৌরবের ধন !
সংসার সাগরে তুমি একমাত্র গতি,
ধ্রুবতারা অমূল্য রতন !
তোমারি করুণা বলে, পাষাণে অমৃত গলে,
তুমি আছ,—আছে তাই চন্দ্র সূর্য্য ভাতি,
গগনে এখনও জ্বলে তারকার বাতি ॥

(৬)

তৃষা দূর করি যুবা ধীরে ছাড়ে শ্বাস,
দু'নয়নে বহে বারিধারা ॥

মুগ্ধ প্রায় চেয়ে রয়—নাহি সরে ভাষ !
মত্ত চিত্ত সত্য আত্মহারা !!
শুষ্ককণ্ঠে—"মায়া" ! দূর অতীতের ছায়া,
স্মৃতির বৃশ্চিক জ্বালা—করি সহচর !
বিষম দংশনে অঙ্গ—করে জ্বর জ্বর !!

(৭)

সম্পদের সাথী যত সবে পলায়িত !
এ জীবন মরুভূমি প্রায় !
গুপ্ত ছুরী স্বার্থ সনে সযত্নে রক্ষিত,
অসময়ে কেবা মুখ চায় ?
কুহকিনী কুহুস্বরে,—সঁপি প্রাণ অকাতরে,
বারে বারে সুধাইত—ভালবাস তুমি ?
তুমি যদি ভালবাস—স্বর্গ মর্ত্ত্যভূমি !!

(৮)

মনে আছে সেই দিন—দিনান্তে যখন,
কান্তপদ মাগিতে দর্শন ।
ভ্রান্ত-মদে মুগ্ধ মন—এই অভাজন,
হেলায় ঠেলিত আকিঞ্চন !!!

ভাবি নাই একবার, বিষময় এ সংসার,
মূর্ত্তিমান ছলনার-রঙ্গ-রঙ্গালয় !
চলিতেছে শুধু সেথা পাপ-অভিনয় !!

(৯)

ছায়া-দেহী সম যত অভিনেতাগণ !
নানা সাজে করে আগমন !
বন্ধুবেশে হেসে হেসে আসে কত জন,
ওঠে শেষে কাতর ক্রন্দন !!
প্রণয়িনী রূপ ধরি, ছানিত মাধুরী হরি,
কেহ আসি ধীরি ধীরি মালা দেয় গলে।
কুসুমে নেহারি ছিছি—গরল উথলে !!

(১০)

ঘুচিয়াছে ঘুমঘোর—খুলেছে নয়ন,—
সমুদিত তরুণ তপন !
দারিদ্র্যের দুঃখময় নির্দ্দয় পীড়ন,—
দানিয়াছে নবীন জীবন !!
অর্থ হীন অতি দীন—আশার আলোক লীন,
নিরাশা আঁধারে তুমি পূর্ণিমা-রূপিণী !
গুণবতী সাধ্বী সতী—প্রাণ প্রদায়িনী !!

(১১)

মৃতপ্রায় শুয়ে হায় ! এ রোগ শয্যায়—
বুঝিয়াছি মরমে মরমে,
সুখ দুঃখে সমব্যথী কে আছে ধরায়
তুমি—"মায়া" ! মায়ার জনমে !!
পত্নী প্রেম যেই জন, নাহি করে আকিঞ্চন,
হাহাকার হয় সার তাহার জীবনে।
কোথা শান্তি ? ভ্রান্তিময় সংসার-স্বপনে !!

(১২)

আবেশে কাঁপিল কায়া—কহে "মায়া" ধীরে,
ধারা বহে কমল নয়নে—
"বজ্রাঘাতে ঝঞ্ঝাবাতে সাগরের নীরে,
ধেয়ে যাই তোমার বচনে !
তুমি প্রভু, আমি দাসী, শ্রীচরণ অভিলাষী,
ঠেল পায়—ক্ষতি তায়—নাহি কিছু লেশ।
ইহলোকে পতি তুমি—প্রাণান্তে প্রাণেশ ॥"

(১৩)

দেহ প্রাণ করি পণ—শুশ্রূষার ফলে
ক্রমে যুবা নীরোগ হইল !

পতিব্রতা সাধ্বী সতী—নয়নের জলে
পুণ্যবলে সকলি ফিরিল !!
সম্পদ গৌরব যত, হয়েছিল অপহৃত,
বর্ষ না হইতে গত—আবার মিলিল।
ভগ্ন গৃহে ভাগ্যলক্ষ্মী আবার হাসিল ॥ *

ষষ্ঠ উল্লাস।

—— * ——

ষ্টারে অমরেন্দ্রনাথ।

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রকুমার মিত্র, এম, এ, বি, এল ও শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন পাঁড়ে মহাশয়দের স্বত্বাধিকারিত্বে মিনার্ভা থিয়েটার তখন

---

* অমরেন্দ্রনাথের বড় আদরের ক্লাসিক থিয়েটার যখন ভাঙ্গিয়া যায় তখন তাঁহার জীবনের এক ভীষণ দিন আসিয়াছিল। তখন তিনি চতুর্দ্দিক হইতে বিপন্ন হইতেছিলেন। শেষে কঠোর রোগে আক্রান্ত হইয়া মৃতকল্প হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু সাধ্বী পতিপ্রাণা পত্নী শ্রীমতী হেমনলিনীর প্রাণপণ শুশ্রূষায় ও তাঁহার পাতিব্রত্য প্রভাবে তিনি রোগমুক্ত হইলেন এবং বর্ষ যাইতে না যাইতে আবার ভাগ্যলক্ষ্মীর মুখদর্শন করিলেন। এই কবিতাটী ১৩১৮ সালের মাঘ মাসের নাট্যমন্দিরে প্রকাশিত হয়।

প্রবল প্রতাপে চলিতেছিল। মিনার্ভা থিয়েটারের সহিত প্রতিযোগিতায় বহু পুরাতন ষ্টারও ঘাল হইয়া যাইতেছিল। এমন অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল যে ষ্টারের দরজা বন্ধ করিতে হয়। ষ্টার থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ থিয়েটার বজায় রাখিবার জন্য অমরেন্দ্রনাথকে তাঁহাদের থিয়েটারে আনিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ১৩১৪ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে অমরেন্দ্রনাথ ষ্টার থিয়েটারে যোগদান করিলেন। এত দিন পরে অমরেন্দ্রনাথ ষ্টার থিয়েটারে যোগদান করিলেন এ কথা অতি শীঘ্রই সহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। নাট্যামোদী সুধীবৃন্দ তাঁহার অভিনয় দেখিবার জন্য উৎসুক হইয়া পড়িলেন।

অমরেন্দ্রনাথ ষ্টার থিয়েটারে যোগদান করিয়া তাঁহার চিরপ্রিয় অভিনেত্রী কুসুমকুমারীকে ষ্টার থিয়েটারে লইয়া আসিলেন। ষ্টার থিয়েটারে অমরেন্দ্রনাথ এ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ম্যানেজারের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ ষ্টার থিয়েটারে যোগদান করিবার পর ষ্টার থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ ষ্টারে চন্দ্রশেখরের অভিনয়ের আয়োজন করিলেন। চন্দ্রশেখরে প্রতাপের ভূমিকা লইয়া অমরেন্দ্রনাথ সর্ব্বপ্রথম ষ্টার রঙ্গমঞ্চে দর্শন দিলেন। এই প্রতাপের ভূমিকা অমরেন্দ্র-নাথের আর এক মহতী কীর্ত্তি। চন্দ্রশেখরে প্রতাপের ভূমিকা পূর্ব্বে এক সুপ্রসিদ্ধ অভিনেতার দ্বারা অভিনীত হইত, কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ এই ভূমিকার এমন একটা নূতন প্রাণ প্রদান করিলেন, যে দর্শকগণের ঘন ঘন করতালির ধ্বনিতে সে দিন রঙ্গমঞ্চ মুখরিত

হইয়া যেন ভাঙ্গিয়া পড়িবার মত হইয়াছিল। চন্দ্রশেখরে প্রতাপের ভূমিকাটী অমরেন্দ্রনাথ একেবারে জ্বালাইয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহার সময়ে ও তাঁহার মৃত্যুর পর অনেক বড় বড় নামজাদা অভিনেতার দ্বারা এই ভূমিকাটী অভিনীত হইয়াছে, কিন্তু কেহই এই ভূমিকার অভিনয়ে তাঁহার সমকক্ষ হইতে পারেন নাই।

অমরেন্দ্রনাথের ষ্টার থিয়েটারে কয়েকমাস অভিনয় করিবার পরই কোহিনুর থিয়েটারের প্রতিষ্ঠা হয়। কোহিনুর থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় দশ সহস্র মুদ্রা বোনাস দিয়া গিরিশ বাবুকে মিনার্ভা থিয়েটার হইতে ভাঙ্গাইয়া নিজের থিয়েটারে আনয়ন করিলেন। গিরিশবাবু, সুরেন্দ্রনাথ ও তিনকড়িকে তাহার সহিত কোহিনুর থিয়েটারে লইয়া আসিলেন। মিনার্ভা থিয়েটারের স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রকুমার মিত্র, এম, এ, বি, এল, ও শ্রীযুক্ত মনমোহন পাঁড়ে এই সংবাদ পাইবামাত্র ছয় হাজার টাকা বোনাস দিয়া অমরেন্দ্রনাথ ও কুসুমকুমারীকে ষ্টার থিয়েটার হইতে ভাঙ্গাইয়া তাহাদের থিয়েটারে লইয়া আসিলেন। মিনার্ভা থিয়েটারে তখন গিরিশচন্দ্রের ছত্রপতি নাটকের মহালা চলিতেছিল। অমরেন্দ্রনাথ ছত্রপতি নাটকে শিবাজীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। মিনার্ভা থিয়েটারে যোগদান করিয়া অমরেন্দ্রনাথ "দলিতা ফণিণী" নামে একখানি গীতি নাট্য রচনা করিয়াছিলেন। এই গীতি নাট্যে অমরেন্দ্রনাথ নরেন্দ্রনাথের

ভূমিকা গ্রহণ করেন। এই ভূমিকাটী তিনি এত সুন্দর অভিনয় করিয়াছিলেন যে তাহা আর অন্য কোন অভিনেতার দ্বারা তেমনটী হইবার সম্ভব নয় দেখিয়া থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ সেই পুস্তক খানি আর অভিনয় করেন নাই। অমরেন্দ্রনাথ "দলিতা ফণিণী" গীতি নাট্যে নরেন্দ্রনাথের ভূমিকায় অবতীর্ণ হইয়া যখন বলিতেন, "এ প্রেম না কৃতজ্ঞতা", তখন সমস্ত দর্শকের সর্ব্বাঙ্গ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিত।

অমরেন্দ্রনাথ প্রায় আট নয় মাস মিনার্ভা থিয়েটারে ম্যানেজার রূপে অবস্থান করিয়াছিলেন। তার পর কোন কারণে মিনার্ভার কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের সহিত তাঁহার মতান্তর হওয়ায় তিনি কুসুম-কুমারীকে লইয়া আবার আসিয়া ষ্টার থিয়েটারে যোগদান করেন। ১৩১৫ সালের ১২ই বৈশাখ অমরেন্দ্রনাথ আবার চন্দ্রশেখরের প্রতাপের ভূমিকা লইয়া ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন। অমরেন্দ্র-নাথের শক্তি যে কত দূর ছিল তাহা উপরি লিখিত ঘটনা হইতেই বুঝিতে পারা যায়। কোহিনুর থিয়েটারের প্রবল আক্রমণ হইতে অমরেন্দ্রনাথ একাই মিনার্ভা থিয়েটারকে খাড়া করিয়া রাখিয়া-ছিলেন।

অমরেন্দ্রনাথ ষ্টার থিয়েটারে আসিলেন,—সঙ্গে সঙ্গে ষ্টারের কদর আবার বাড়িয়া উঠিল। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময় অমরেন্দ্রনাথের অভিনয় দেখিবার জন্য নাট্যামোদী সুধীবৃন্দ

দানীবাবু, সতীশবাবু, নিখিলবাবু, নেপেনবাবু প্রভৃতি বন্ধুগণ পরিবেষ্টিত অমরেন্দ্রনাথ ও তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান গিরিধারি।

আকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ ষ্টারে আসিবার সঙ্গে সঙ্গে ষ্টারের দর্শক সংখ্যাও দ্বিগুণ হইয়া গেল। এইরূপ শুনিতে পাওয়া যায় যে, এইবার অমরেন্দ্রনাথ ষ্টার থিয়েটারে যোগদান করিয়া প্রথম যে দিন আবার চন্দ্রশেখরে প্রতাপের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া ষ্টার রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হন, সেই দিন মিনার্ভা থিয়েটারে দ্বিজেন্দ্র-লালের 'নুরজাহান' নাটকের প্রথম অভিনয় রজনী। অমরেন্দ্রনাথের অভিনয় দেখিতে তখন লোকে এতই ব্যাকুল যে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকের প্রথম অভিনয় সত্ত্বেও সে দিন ষ্টারে লোকের এত ভীড় হইয়াছিল, যে মিনার্ভায় ২৫০ শত টাকার অধিক বিক্রয় হয় নাই। ইহার কিছু দিন পরে, ১৯০৮ খৃষ্টাব্দের ১৫ই সেপ্টেম্বর, কলিকাতা মিয়ুনিসিপালিটি একটী নূতন আইন পাশ করিলেন। এই আইনের দ্বারা তাঁহারা কলিকাতার সমস্ত থিয়েটারের স্বত্বাধিকারীদিগকে জানাইয়া দিলেন যে তাঁহারা কেহই রাত্রি একটার অধিক তাঁহাদের থিয়েটারে অভিনয় করিতে পারিবেন না। কিন্তু অর্দ্ধরাত্রে থিয়েটার ভাঙ্গিলে মফঃস্বলবাসীদের বিশেষ অসুবিধা হয় দেখিয়া অমরেন্দ্রনাথ সে আইনে ভ্রূক্ষেপ করিলেন না। তিনি যেমন পূর্ব্বেও তাঁহার থিয়েটারে সমস্তরাত্রিব্যাপী অভিনয় করিতেন এখনও সেইরূপ থিয়েটার চালাইতে আরম্ভ করিলেন। এই আইন ভঙ্গ করিবার জন্য তিনি মিয়ুনিসিপালিটীকে যে কত টাকা জরিমানা দিয়াছেন তাহার সংখ্যা হয় না। যে দিন এই আইন প্রথম পাশ হয় সেই রাত্রে নটকুলচূড়ামণি

অৰ্দ্ধেন্দুশেখর মুস্তফি জোড়াসাঁকো থাকবাবুর বাড়ীতে স্বর্গারোহণ করেন। দ্বিতীয় বার ষ্টার থিয়েটারে যোগদান করিয়া অমরেন্দ্রনাথ প্রায় তিন বৎসরকাল তথায় কার্য্য করেন। এই সময় নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি ষ্টার থিয়েটারে মহাসমারোহে অভিনীত হয়,—"কামিনী কাঞ্চন", "জীবনসন্ধ্যা", "কেয়া মজাদার", "ইন্দিরা", "কর্ম্মফল", "কুসুমে কীট", "আশাকুহকিনী", "রাণী ভবানী"।

এই সময়, ১৩১৬ সালে, অমরেন্দ্রনাথ গিরিশচন্দ্র ও শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়কে লইয়া একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। এই পত্রিকাখানির নাম দেন তিনি "নাট্য মন্দির"। নাট্যশালার মুখপত্র হইয়া এই মাসিক পত্র বাহির হয়। তিন বৎসর কার্য্য করিবার পর তাঁহার আবার ষ্টার থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়-গণের সহিত মনোমালিন্য উপস্থিত হয় এবং আবার তিনি ষ্টার থিয়েটারের সহিত সমস্ত সম্পর্ক রহিত করিয়া দেন এবং বিডন ষ্ট্রীটের বিখ্যাত জমিদার শ্রীযুক্ত বাবু অনাথনাথ দেব মহাশয়কে ধরিয়া পুরাতন বেঙ্গল থিয়েটার ভাঙ্গিয়া নূতন এক প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা নির্ম্মাণ করাইয়া "গ্রেট ন্যাসান্যাল" থিয়েটার নাম দিয়া তথায় একটী নূতন থিয়েটারের পত্তন করেন।

১৯১১ খৃষ্টাব্দে ১৭ই জুন "গ্রেট ন্যাসান্যাল" থিয়েটারের উদ্বোধন হয়। সেই দিন হইতে মিনার্ভা থিয়েটারের পরিচালনার ভার

শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রকুমার মিত্র এম, এ, বি, এল মহাশয় শ্রীযুক্ত বাবু মনোমোহন পাঁড়ের নিকট হইতে স্বয়ংই গ্রহণ করেন। এখানে আসিয়া অমরেন্দ্রনাথ দুইখানি পুস্তক রচনা করেন,—"আহামরি" এবং "জীবনে মরণে"। এই দুইখানি পুস্তকই "গ্রেট ন্যাশান্যাল" থিয়েটারে প্রথম রাত্রিতে অভিনীত হয়। যে দিন "গ্রেট ন্যাশানাল" থিয়েটার খোলা হয়, সেই দিন বেলা পাঁচটা না বাজিতেই থিয়েটারের যাবতীয় আসন বিক্রয় হইয়া যায়। সন্ধ্যার সময় থিয়েটারে এরূপ জনতা হয় যে সেরূপ জনতা বহুকাল কোন থিয়েটারের ভাগ্যে ঘটে নাই। আমরাও সে দিন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারের অভিনয় দেখিতে গিয়াছিলাম। সকালেই একখানি সম্মুখের আসন চারিটাকা দিয়া কিনিয়া আনাইয়াছিলাম। কিন্তু থিয়েটারে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম ভিতরে প্রবেশ অসম্ভব,—লোকের উপর লোক প্রবেশ করিবার জন্য ঠেলাঠেলি মারামারি করিতেছে। টিকিট বন্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তথাপি লোকের ভীড় টিকিট ঘরের সম্মুখ হইতে কিছুতেই কমিতেছে না। সকলেই চীৎকার করিতেছে, "মশাই একখানা টিকিট দিতেই হইবে। আমরা বসিতে চাহি না, শুদ্ধ একটু দাঁড়াইয়া দেখিয়া যাইব।"

আমরা বহু কষ্টে ভিতরে প্রবেশ করিলাম, ভিতরে গিয়া দেখিলাম একখানি চেয়ারও খালি নাই। আমরা একখানি আসনের জন্য দ্বাররক্ষককে ক্রমাগত তাগাদা করিতে লাগিলাম। অনেকেরই

আমাদের মত অবস্থা,—সকলেই আমাদের মত দ্বাররক্ষককে আসনের জন্য তাগাদা করিতেছেন। সে বেচারি একেবারে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। সে যে কি বলিবে কিছুই স্থির করিয়া উঠিতে পারিতে-ছিল না। সেই সময় এক ব্যক্তি আসিয়া চীৎকার করিয়া বলিলেন, "মহাশয়গণ, অনুগ্রহ করিয়া একটু অপেক্ষা করুন, চেয়ার ভাড়া করিতে গিয়াছে, এখনই আসিবে।"

আমরা সেই চেয়ারের আশায় আকুল হইয়া এক পার্শ্বে গিয়া দাঁড়াইলাম। প্রথম কন্সার্ট বাজিয়া গেল, আমরা ঠিক দাঁড়াইয়াই আছি। দ্বিতীয় বার কন্সার্ট আরম্ভ হইতে যাইতেছে, ঠিক সেই সময় চেয়ার আসিয়া উপস্থিত হইল। আমাদের মত অনেক লোক দাঁড়াইয়াছিলেন, কাজেই চেয়ার আসিবামাত্র রীতিমত কাড়াকাড়ি আরম্ভ হইয়া গেল। আমরাও বহু কষ্টে কাড়াকাড়ি করিয়া একখানা চেয়ার পাইয়াছিলাম। নূতন থিয়েটার, প্রথম অভিনয় রজনী,—বন্দোবস্তের ত্রুটি অনেকই, তথাপি যখন অভিনয় আরম্ভ হইল তখন ঐ ভীড় একেবারেই নিস্তব্ধ। অভিনয়ও যাহা হইল,—তাহাও চরম। অমরেন্দ্রনাথ "জীবনে মরণে" পুস্তকে যে ভূমিকাটী লইয়াছিলেন,—সে ভূমিকার কিরূপ অভিনয় হইল তাহা লেখাই বাহুল্য। এমন সুন্দর অভিনয় সত্যই আমরা বহুকাল দেখি নাই। থিয়েটার যখন ভাঙ্গিল তখন সকলে আশাতীত প্রীত,—সকলেই বলাবলি করিতে লাগিলেন, "না, বেশ নূতন বটে।"

গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে অমরেন্দ্রনাথ প্রায় নয় মাস কাল অভিনয় করিয়াছিলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দের প্রথমেই ষ্টার থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে, তাঁহারা আর থিয়েটার চালাইবেন না। উপযুক্ত গ্রাহক পাইলে তাঁহারা তাহাদের থিয়েটার বাটীটি ভাড়া দিবেন। অমরেন্দ্রনাথের নিকটও এ সংবাদ আসিয়া উপস্থিত হইল। গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটারে দর্শকগণের বসিবার স্থানটা বড়ই সঙ্কীর্ণ। প্রতি শনিবার রাত্রেই স্থানাভাবে মনঃক্ষুণ্ণ হইয়া বহু দর্শককেই ফিরিয়া যাইতে হইত। এই কারণে অমরেন্দ্রনাথ একটা বড় থিয়েটার গ্রহণের জন্য মনে মনে বড়ই ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তিনি যখন শুনিলেন ষ্টার থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণ তাঁহাদের থিয়েটারটী ভাড়া দিবেন তখনই তিনি সেই থিয়েটারটী ভাড়া লইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন ও অনেক দর কসাকসির পর উপযুক্ত লেখাপড়া করিয়া অমরেন্দ্র-নাথ ষ্টার থিয়েটার ভাড়া করিয়া নূতন করিয়া খুলিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। অমরেন্দ্রনাথ সহসা গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার পরিত্যাগ করায় অনাথবাবু বিশেষ বিরক্ত হইলেন। তিনি তাঁহার পুরাতন ক্ষুদ্রকায় বেঙ্গল থিয়েটার ভাঙ্গিয়া চুরিয়া কেবল অমরেন্দ্রনাথের জন্যই বহু অর্থ ব্যয় করিয়া নূতন থিয়েটার নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, আর অমরেন্দ্রনাথ কিনা যেমন একটু স্থবিধা পাইলেন আর অমনি ষ্টার থিয়েটারে চলিয়া গেলেন! অমরেন্দ্রনাথের শত্রুর অভাব ছিল না। তাঁহারা আসিয়া এই

ব্যাপার লইয়া অনাথবাবুকে নানাভাবে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের ক্রমাগত উত্তেজনায় অনাথবাবুও রীতিমত উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তিনি অমরেন্দ্রনাথের নামে আদালতে মামলা রুজু করিবেন স্থির করিলেন। অনাথবাবু যে মামলা রুজু করিতে যাইতেছেন অমরেন্দ্রনাথের নিকট এ সংবাদ উপস্থিত হইতে বিলম্ব হইল না। অমরেন্দ্রনাথ ষ্টার থিয়েটার সবে গ্রহণ করিয়াছেন,—নূতন ভাবে, নূতন ছাঁদে তিনি ষ্টার থিয়েটার চালাইবার আয়োজনে ব্যস্ত। কাজেই তিনি এ সময় অনাথবাবুর সহিত মামলা মোকর্দ্দমা করিতে ইচ্ছুক হইলেন না। তিনি এই সংবাদ পাইবামাত্রই অনাথবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবেন স্থির করিলেন।

এ্যটর্ণী আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন, অনাথবাবুও মামলার কাগজপত্র এ্যটর্ণীকে বুঝাইয়া দিতেছেন, ঠিক সেই সময় অমরেন্দ্রনাথ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। অনাথবাবু নিজেকে একটু গম্ভীর করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের এমনি একটা স্বাভাবিক শক্তি ছিল যে তাঁহার সম্মুখে শত্রু মিত্র যেই হউক কাহারও গম্ভীর হইয়া থাকিবার উপায় ছিল না। অনাথবাবুও গম্ভীর থাকিতে পারিলেন না, অমরেন্দ্রনাথ সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইবামাত্র তাহাকে বলিলেন, "এস ভায়া এস,—বোস।"

অমরেন্দ্রনাথ বসিতে বসিতে হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "শুনিলাম নাকি আপনি আমার নামে নালিস করিতেছেন?"

অনাথবাবুর প্রাণ বলিতে কহিল, 'হাঁ! সেটা কি বিশেষ অন্যায় করিতেছি?' কিন্তু তাঁহার মুখ হইতে সে কথা বাহির হইল না,—তিনি বার দুই আম্‌তা আম্‌তা করিয়া বলিলেন, "না না,—ও,—মিথ্যা,—আমি কি তোমার নামে নালিশ করিতে পারি! তবে কথা হইতেছে কি জান ভায়া,—কাজটা কি তোমার ভাল হইয়াছে?"

অমরেন্দ্রনাথ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি আপনার ছেলের সমান; ছেলের অপরাধ পদে পদেই হইতে পারে। আপনার তো কিছুই অজানা নাই? এখানে থিয়েটার খুলিয়া পর্য্যন্ত আমি কেবল লোকসান দিয়াই আসিতেছি। এমন একদিনও দেখিলাম না যে সবাইকে স্থান দিতে পারিলাম। আপনার থিয়েটারে লোক বসিবার যত স্থান আছে তাহাতে আমার থিয়েটার কিছুতেই চলিতে পারে না। ক্রমাগতই আমায় লোকসান খাইতে হয়। এ অবস্থায় আপনি যদি বলেন,—লোকসান হইলেও তোমাকে এই থিয়েটারে থাকিতে হইবে, তাহা হইলে আমি নাচার। আমাকে থাকিতেই হইবে। বলুন আমার কি করা উচিত? আর—তা ছাড়া আপনার দশ বিশ হাজার টাকা এখন গেলেই বা কি থাকলেই বা কি? কিন্তু আমাকে একেবারে মারা যাইতে হয়।"

অমরেন্দ্রনাথের এই লম্বা বক্তৃতার সম্মুখে অনাথ বাবুকে পরাস্ত হইতে হইল। তাঁহাকে বলিতে বাধ্য হইতে হইল, "না—না, আর

এমন কথা তোমায় বলিতে পারি না,—যে তুমি এইখানে থাকিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হও। আমার বাড়ী পড়িয়া থাকিবে না। তোমার যাহাতে সুবিধা হয় তুমি তাই কর। তবে এটা তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া যাও যে আমি তোমার নামে নালিশ করিব না।"

এরূপ ঘটনা অমরেন্দ্রনাথের জীবনে বহুবার ঘটিয়াছে। তাঁহার দৃষ্টিতে, তাঁহার বচনে, এমন একটা মোহিনী শক্তি ছিল যে শত্রু মিত্র যিনিই হউন্—একবার তাঁহার সম্মুখে আসিয়া পড়িলে তাঁহাকে মাথা হেট করিতেই হইত।

যে ষ্টার থিয়েটার দর্শক অভাবে বন্ধ হইয়াছিল, অমরেন্দ্রনাথের আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে তাহা আবার দর্শকে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল। অমরেন্দ্রনাথ প্রাণপণ পরিশ্রমে ষ্টারের আবার পূর্ব্ব গৌরব ফিরাইয়া আনিলেন। অমরেন্দ্রনাথ ষ্টার থিয়েটারে আসিয়াই দ্বিজেন্দ্রলালের পরপারে নাটক অভিনয় করিবার জন্য গ্রহণ করিলেন ও মহোৎসাহে তাহার মহালা আরম্ভ করিয়া দিলেন। দ্বিজেন্দ্রলালের সহিত এক সময়ে ষ্টার থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষীয়গণের মতভেদ হওয়ায় তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে তাঁহার কোন নাটক ষ্টার থিয়েটারে অভিনয়ের জন্য প্রদান করিবেন না। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ ষ্টার থিয়েটার গ্রহণ করিয়াই, তাঁহার সে মতের পরিবর্ত্তন করিলেন। তিনি দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম সামাজিক নাটক পরপারে অভিনয় করিলেন। একে অমরেন্দ্রনাথের পরিচালনায় ষ্টার

থিয়েটার চলিতেছে,—তাহার উপর দ্বিজেন্দ্রলালের প্রথম সামাজিক নাটকের অভিনয়, ঠিক যেন মণিকাঞ্চনের সংযোগ হইল।

যে রাত্রে ষ্টার থিয়েটারে পরপারে নাটকের অভিনয় হয় সে রাত্রে দর্শকের ভীড় এরূপ গুরুতর হইয়াছিল, যে অভিনয় হইবার বহু পূর্ব্বেই টিকিট বিক্রয় বন্ধ করিতে হইয়াছিল। কত লোক যে টিকিট না পাইয়া নিরাশ হইয়া ফিরিয়াছিলেন তাহার আর সংখ্যা হয় না। অমরেন্দ্রনাথ পরপারে নাটকে বিশ্বনাথের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ভূমিকাটী তিনি এত সুন্দর অভিনয় করিতেন যে তাহা যে দেখে নাই তাহাকে বোঝান অসম্ভব। এই বিশ্বনাথের ভূমিকাটী অমরেন্দ্রনাথের একটী বিশেষ অভিনয়। এই বিশ্বনাথের ভূমিকাটী অন্য কোন অভিনেতার দ্বারা তাঁহার মত হওয়া সম্ভব কি না সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে।

অমরেন্দ্রনাথ ষ্টার থিয়েটার লইয়া বহু নাটকের অভিনয় করিয়াছিলেন। তাহার ভিতর "বাজীরাও" নাটকে বাজীরাওয়ের ভূমিকা, অহল্যাবাঈ নাটকে "মনোহর রাও"এর ভূমিকা, সাজাহানে ঔরঙ্গজেবের ভূমিকা, সাইন অব্ দি ক্রসে "মার্কাসের" ভূমিকা, জয়দেবনাটকে "জয়দেবের" ভূমিকা এবং সওদাগর নাটকে "কুলীরকের" ভূমিকা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপরিলিখিত ভূমিকাগুলির তিনি যেরূপ সুন্দর ও স্বাভাবিক অভিনয় করিয়া গিয়াছেন সেরূপ স্বাভাবিক অভিনয় অদ্যাবধি অন্য কোন অভিনেতার দ্বারা হয় নাই, ভবিষ্যতে হইবারও বড় একটা

আশা আমরা করিতে পারি না। আমরা তাঁহার উপরিলিখিত নাটকগুলির সব কয়টী ভূমিকারই অভিনয় দেখিয়াছি এবং শত মুখে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারি নাই। সওদাগর নাটকে কুলীরকের ভূমিকা, কালি যেন অভিনয় দেখিয়াছি ঠিক এই ভাবে আমাদের চক্ষের উপর আজিও ভাসিতেছে।

অমরেন্দ্রনাথ কেবল যে অভিনেতা ছিলেন তাহা নহে। তাঁহার ন্যায় অধ্যক্ষও বিরল। নূতন সম্প্রদায় গঠন করিতে তিনি একেবারে অদ্বিতীয় ছিলেন। তাহা ছাড়া তাঁহার আর একটি অদ্ভূত শক্তি ছিল,—তিনি রাস্তার কুলি হইতে ধরাপতি রাজা, সকল ভূমিকাই সমান অভিনয় করিতেন। তিনি দর্শকগণকে যেমন কাঁদাইতে পারিতেন, তেমনি হাঁসাইতে পারিতেন। তিনি যখন পরপারে নাটকে বিশ্বনাথের ভূমিকা গ্রহণ করিয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইতেন তখন কোন দর্শকই চোখের জল সংবরণ করিতে পারিতেন না। আবার যখন হারানিধি নাটকে অঘোরের ভূমিকা গ্রহণ করিতেন তখন আবার দর্শকগণের হাসি বন্ধ করা দায় হইত। আমরা দেখিয়াছি থিয়েটার আরম্ভ হইতে যাইতেছে,—এমন সময় অমরেন্দ্রনাথের নিকট সংবাদ আসিল অমুক অভিনেতা আইসেন নাই। অমরেন্দ্রনাথ তখনই সেই অভিনেতার ভূমিকা লইয়া রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন। যে ভূমিকা তিনি এক দিন পর্য্যন্তও দেখেন নাই এমন সব ভূমিকায়ও অপ্রস্তুত অবস্থায়ই রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হইয়াছেন এবং সুখ্যাতির সহিত তাহা অভিনয়

করিয়া আসিয়াছেন। এ একটা কম ক্ষমতার কথা নহে। এ ক্ষমতা অতি অল্প অভিনেতা ও অভিনেত্রীতে দেখিতে পাওয়া যায়।

ষ্টার থিয়েটারে আসিয়া অমরেন্দ্রনাথ আর একখানি নাটক অভিনয় করিয়া বিশেষ সুখ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছিলেন। এখানি নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসুর "খাস দখল"। এই খাস দখল নাটকে অমরেন্দ্রনাথ মোহিতের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই ভূমিকাটী অভিনেতা ও অভিনেত্রী অনেকেই অভিনয় করিয়াছেন, কিন্তু আজি পর্য্যন্ত অমরেন্দ্রনাথের সমকক্ষ কেহই হইতে পারেন নাই। এই নাটকের প্রথম দৃশ্যে অমরেন্দ্রনাথের সেই,—

"লুকায়ে চোরের প্রায়—নিশিতে ঝরিয়া হায়
নলিনী মলিনী কেন করিয়া শিশির,
ভূমিগত পদ্মলতা তার প্রাণে দিলি ব্যথা
কি লাভ ইহাতে—তোমার পিসির?"

এই আবৃত্তিটুকু আজিও আমাদের প্রাণের ভিতর ঝঙ্কার দিতেছে। খাসদখল নাটকের মোহিতের ভূমিকাটী অমরেন্দ্রনাথ এমন সুন্দর সজীব করিয়া তুলিয়াছিলেন যে উহা প্রত্যেক দর্শকের প্রাণের ভিতর একটা নূতন ছবি চিরদিনের মত অঙ্কিত করিয়া দিয়াছে। অমরেন্দ্রনাথ বহু দিন দিব্যধামে চলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার সেই সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর আজিও আমাদের কাণে বাজিতেছে।

সপ্তম উল্লাস।

---*---

দাম্পত্য ধর্ম্ম।

অমরেন্দ্রনাথ যে ভাগ্যবান্ ছিলেন তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। শৈশবে তিনি পিতামাতার আদরের দুলাল ছিলেন। তাঁহাদের অনুপম স্নেহ ও আদরে তিনি শৈশবে ও কৈশোরে পালিত হইয়াছিলেন,—তাঁহার দুঃখ বলিয়া কিছুই ছিল না। যৌবনে তিনি ইচ্ছাকৃত অমিতচারিতার জন্য বহু বিপদে পড়িয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহাতে তাঁহার ভাগ্যের দোষ দেওয়া যায় না। তিনি যে পত্নী পাইয়াছিলেন, তেমন পত্নীলাভ অনেকের ভাগ্যেই ঘটে না। পূর্ব্বজন্মকৃত বহুপুণ্য না থাকিলে মানুষের এমন পত্নীলাভ ঘটে না। অমরেন্দ্রনাথের পত্নী শ্রীমতী হেমনলিনী সত্যই একজন আদর্শ হিন্দুমহিলা ছিলেন। তাঁহার হৃদয়ে দিন রাত যে পতিভক্তির লহর বহিত, তাহা সত্যই প্রত্যেক হিন্দু নারীর অনুকরণের সামগ্রী। বিবাহের পর অমরেন্দ্রনাথ প্রথম যৌবনে পত্নীকে নিতান্ত আদরে রাখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু পুত্রের জন্মগ্রহণের পর হইতেই পত্নীর সহিত তাঁহার ছাড়াছাড়ি হয়। ঐ সময় হইতে তিনি নিতান্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িলেন। তখন আর তিনি একদিনের জন্য পত্নীর কথা ভাবেনও নাই। কিন্তু তাঁহার সাধ্বী পত্নীর হৃদয়ে একদিনের জন্যও

পতিভক্তির অভাব হয় নাই। তিনি জানিতেন স্বামী তাঁহার নরদেবতা, মূর্ত্তিমান্ নারায়ণ। তিনি সেই দেবতার মূর্ত্তি হৃদয়ে গড়িয়া তাঁহারই কৃপায় সদানন্দে দিন কাটাইতেন। আমরা শুনিয়াছি তাহার মুখে হাসি ভিন্ন কেহ কোন দিন বিষাদের চিহ্ন পর্য্যন্ত দেখে নাই।

ষ্টার থিয়েটার শেষবার যখন অমরেন্দ্রনাথের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালিত হইতেছিল অর্থাৎ অমরেন্দ্রনাথ যখন ষ্টার থিয়েটার 'লিজ' লইয়া উহার ম্যানেজার হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার ভাগ্যাকাশ বেশ সুপ্রসন্ন ও নির্মেঘ হইয়া আবার বিমল শারদ-চন্দ্রিকায় জগৎ বিমোহিত করিতেছিল, সেই শুভ কনকপ্রভাতে অমরেন্দ্রনাথের সাধ্বী পত্নী তাঁহার একমাত্র পুত্রকে স্বামীর হস্তে সমর্পণ করিয়া ইহলোকের মায়া পরিত্যাগপূর্ব্বক অমরধামে চলিয়া যান। আমরা অমরেন্দ্রনাথের আত্মীয় স্বজনের মুখে শুনিয়াছি যখন সাধ্বী স্বামীর কোলে মাথা রাখিয়া শেষ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন তখন তাঁহার মুখে একটুও বিষাদের ছায়া পড়ে নাই। মৃত্যুর পরেও তাঁহার মুখের উপর একটা মহা শান্তির হাসি ফুটিয়াছিল। যাঁহার এমন সাধ্বী পত্নী তাহার কি বিপদ হইতে পারে! সাধ্বীর পতিভক্তির পুণ্যবলে তাঁহার স্বামী যে বিপদেই পড়ুন,—যে বিপথেই গমন করুন,—কোন বিপদেই তাঁহাকে একেবারে গ্রাস করিয়া ফেলিতে পারে না। অমরেন্দ্রনাথ নানা বিপদে পড়িয়াছেন বটে, কিন্তু কোন বিপদেই তাঁহাকে একেবারে গ্রাস করিতে পারে নাই। চারিদিক হইতে অনন্ত বিষাদ

আসিয়া অমরেন্দ্রনাথকে ঘিরিয়াছে,—কোথাও একটু আশার আলো না দেখিয়া তিনি যখন আত্মবিনাশে সকল জ্বালার অবসান করিবেন স্থির করিয়াছেন, ঠিক সেই সময় কোথা হইতে এক পুণ্যের জ্যোতি আসিয়া তাঁহাকে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিয়া আবার তাঁহাকে বিশ্বের বুকের উপর অখণ্ড গৌরবে দাঁড় করাইয়া দিয়াছে। কাহার পুণ্যবলে তিনি এই সকল বিপদ হইতে রক্ষা পাইলেন তখন তিনি যৌবনের উষ্ণ শোণিত-প্রবাহে তাহা বুঝিতে না পারিলেও শেষে তিনি তাহা বুঝিয়াছিলেন,—তাই জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত তাহাকে দারুণ মনস্তাপ ভোগকরিতে হইয়াছে। "অভিনেত্রীর রূপ" নামক পুস্তক ও অনুতাপ-শীর্ষক কবিতা পাঠ করিলে অমরেন্দ্রনাথের প্রাণের অনেক কথাই জানিতে পারা যায়। অভিনেত্রীর রূপে অমরেন্দ্রনাথ যাহা লিখিয়াছেন তাহার কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিবার প্রলোভন আমরা কিছুতেই ত্যাগ করিতে পারিলাম না। আমাদের পাঠক-পাঠিকার অবগতির জন্য তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম ঃ—

"সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে। দুর্গা আপনার ঘরে বসিয়া মহাভারতের বন পর্ব্ব পাঠ করিতেছিল, এমন সময় তাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা আসিয়া সংবাদ দিল "জামাই বাবু আসিয়াছেন।" দুর্গা উঠিয়া দাঁড়াইল, অসংযত কেশরাশি যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করিল, বক্ষের শোণিত অপেক্ষা প্রিয় নিদ্রিত সন্তানটীকে শয্যার উপর শোয়াইল।

যুক্তকরে মধুসূদনকে ডাকিয়া বলিল, "আজি যদি কোন বিপদে পড়িয়া তিনি আমার কাছে আসিয়া থাকেন,—তাঁহার পায়ে যেন একটী কাঁটাও না বিঁধে !"

"মহা অপরাধীর ন্যায় নলিনী গৃহে প্রবেশ করিল। বহু কালের সাধনার পর অভীষ্ট দেবতাকে সম্মুখে দেখিয়া ভক্তের প্রাণে যেরূপ অনির্ব্বচনীয় আনন্দস্রোত প্রবাহিত হয়, অনেক দিনের পর নলিনীকে দেখিয়া দুর্গার সন্তপ্ত চিত্ত সেইরূপ উল্লাসে ও উৎসাহে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু কেমন কিসের একটা অজানিত আতঙ্কের ছায়া তাহার সম্পূর্ণ সুখ ও সম্পূর্ণ তৃপ্তি উপভোগের পক্ষে বিষম কণ্টক হইয়া দাঁড়াইল।"

"নলিনী অনন্যোপায় হইয়া, লজ্জার মাথা খাইয়া, তাহার বিপদের কথা দুর্গাকে জানাইল। দুর্গা কোন কথা না কহিয়া, কোনরূপ প্রতিবাদ না করিয়া, নলিনীর নির্দ্দয় ব্যবহারের কথা কোনরূপ উল্লেখ না করিয়া তাহার গহনার বাক্সটা স্বামীর হাতে তুলিয়া দিয়া করুণ কণ্ঠে বলিল, "এই আমার সর্ব্বস্ব। তোমারই সামগ্রী তোমারই কার্য্যে উৎসর্গ করিলাম। আমার একটী মাত্র অনুরোধ ভ্রাতৃ-বিরোধ করিও না, তিনি হাতে তুলিয়া যাহা দেন তাহাই লইয়া সুখী হও। যাও—আর বিলম্ব করিও না,—আজ রাত্রের মধ্যেই এই সকল গহনা বন্ধক দিয়া টাকার যোগাড় কর। কাল বেলা বারটার মধ্যে টাকা জমা না দিলে, বিপদের অবধি থাকিবে না। আমার দুর্ভাগ্য

এতদিন পরে তোমাকে পাইলাম, প্রাণ ভরিয়া দুটো কথা কহিতে পারিলাম না,—তোমার একটু সেবা করিয়া পরকালের কাজও করিতে পারিলাম না। যাক্ সে দুঃখ করিবার সময় আজ নয়। জগদীশ্বর যদি দিন দেন,—অনেক কথা কহিব, সে কথা আর ফুরাইবে না”—এই বলিয়া নলিনীর পায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া দুর্গা ভক্তি-ভরে প্রণাম করিল।”

অমরেন্দ্রনাথ “অভিনেত্রীর রূপের” আর এক স্থানে লিখিয়াছেন, “দুর্গা এখন আর তাহার বাপের বাড়ীতে নাই। নলিনীর মাতা তাহাকে নিজের কাছে আনিয়া রাখিয়াছেন। * * * * দুর্গা মাটীর মানুষ, শ্বাশুড়ী-অন্ত প্রাণ—শ্বাশুড়ীর সেবা করিতে পাইলে সে যেন স্বর্গ হাতে পায়, মুখে সর্ব্বদা হাসিটী লাগিয়াই আছে, তাই নলিনীর মাতা দুর্গাকে নিজের মেয়ের মত ভালবাসেন, তাহার অদৃষ্টের কথা মনে মনে স্মরণ করিয়া গোপনে অশ্রুবর্ষণ করেন। তাহার সব আছে অথচ কিছুই নাই—এই ভাবিয়া সময় সময় তাঁহার বুক যেন ফাটিয়া যায়। এক এক দিন গভীর রাত্রে দুর্গার ঘরে গিয়া দেখেন—সে তখন, ঘুমায় নাই, শাপভ্রষ্টা দেববালার ন্যায় আলুলায়িত-কেশে দীনা হীনা মলিনার বেশে ভগবান্ রামকৃষ্ণের পটখানি সম্মুখে রাখিয়া ভক্তিভরে পূজা করিতেছে। শয্যার উপর সুন্দর সুকুমার শিশুটী অকাতরে ঘুমাইতেছে। দূর হইতে দেখিয়া দেখিয়া দেখিয়া, চাহিয়া চাহিয়া, নলিনীর মাতা আত্মবিস্মৃতা হইয়া উচ্ছ্বসিত হৃদয়ে

অশ্রুপূর্ণ লোচনে ভগবানের উদ্দেশ্যে বলিলেন, "প্রভু! সত্যই কি কলিতে তোমার মহিমা লোপ পাইয়াছে?"

"নিরুপমার সহিত সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিয়া, ক্ষিতীশ ও চন্দ্রাকে বাগান হইতে বিদায় করিয়া দিয়া, দিবা দ্বিপ্রহরে অনাহারে অসুস্থ অবস্থায় নলিনী বাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হইল। নলিনীর মাতা ব্যস্তসমস্ত হইয়া ভাতের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। নলিনী অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুই এক গ্রাস মাত্র খাইল। তারপর দুর্গার সহিত সাক্ষাৎ হইল।"

"নলিনী আজ প্রাণ খুলিয়া কথা কহিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া আসিয়াছিল, কিন্তু এ কি—মুখ ফোটে ফোটে ফোটে না, মন ছোটে ছোটে—ছোটে না!"

"দুর্গা হাসি হাসি মুখে শিশু সন্তানটীকে বুকে লইয়া নলিনীর কোলে তুলিয়া দিল। মধুর অধরে হাসির লহর তুলিয়া, প্রাণের পুত্র নলিনীর কোলের উপর খেলিতে খেলিতে কোমল কিসলয়তুল্য করপল্লব নলিনীর পায়ের উপর রাখিয়া, বুকভরা ব্যথা লইয়া, কঠোর চিত্ত পিতার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। যদিও সে তখনও ভাল করিয়া কথা কহিতে শেখে নাই, তথাপি নলিনী যেন স্পষ্ট শুনিল,—সেই সংসার অনভিজ্ঞ বালক বলিতেছিল, "ছিঃ ছিঃ, তুমি এত নিষ্ঠুর। আমার মাকে কাঁদাইতেছ, আমাকে কাঁদাইতেছ, তোমার কি ভাল হইবে?"

"নলিনীর মনে হইল, যদি এই মুহূর্ত্তে আমার মৃত্যু হয়, তাহা-হইলে আমা অপেক্ষা সুখী কে?"

সাগর তরঙ্গ কোনরূপে প্রতিরোধ করিয়া নলিনী ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, "দুর্গা! সব শেষ হইয়াছে। আমার সাধের স্বপ্ন ফুরাইয়াছে। যে ভুল লইয়া মজিয়াছিলাম, যাহার কুহকে আত্মহারা হইয়া পাপ পুণ্য বিচার করি নাই, এই স্বার্থপূর্ণ সংসারে যাহাকে সর্ব্বস্ব ভাবিয়াছিলাম, যাহার ভালবাসা জীবনের নিত্য উপভোগ্য সামগ্রী ভাবিয়া তোমার মুখ চাহি নাই,—সন্তানের মুখ চাহি নাই, সে আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। তোমার সহিত যেরূপ নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছি, চির জীবন ধরিয়া তোমাকে মর্ম্মান্তিক কষ্ট দিয়াছি, নিজের সুখের ও স্বার্থের জন্য পিশাচের অধম হইয়া তোমাকে যেরূপ অনাদর, উপেক্ষা করিয়াছি তাহার শতাংশের একাংশও তাহার সহিত কখনও করি নাই। তবুও বিনা দোষে,—বিনা কারণে—বৃথা সন্দেহে—সে আমায় ত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে! সব জানিয়াও, সমস্ত বুঝিয়াও এ দুর্ব্বল চিত্তকে কিছুতেই বশে আনিতে পারিতেছি না। প্রাণ কাঁদিতেছে,—বুকের ভিতর আগুণ জ্বলিতেছে, ছুটিয়া গিয়া তাহার পায় ধরিয়া তাহাকে ফিরাইয়া আনিবার জন্য মন আকুল হইতেছে! ছি! ছি! পুরুষ হইয়া জন্মিয়াছিলাম কেন? হৃদয়ের উপর যাহার এটুকুও আধিপত্য নাই, তাহার মরণই মঙ্গল। দুর্গা! মনের পাপ মুক্ত প্রাণে

তোমার নিকটে ব্যক্ত করিলাম, হতভাগ্যের অপরাধ মার্জ্জনা করিও।”

“নলিনী আর চোখের জল ধরিয়া রাখিতে পারিল না, কাঁদিয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া দুর্গার—মুখ—বুক—রমণীজীবনের সুখ—সমস্ত ভাসাইয়া দিল।”

“যে রাক্ষসী মন্ত্র প্রভাবে মোহ জাল বিস্তার করিয়া, তাহার সাধের স্বামীকে পর করিয়াছিল, অজানিত অপরিচিত অপ্রত্যাশিত সুদূর প্রদেশ হইতে আসিয়া যে পিশাচী তাহার অভীষ্ট দেবতার স্বর্গীয় স্নেহ হইতে বঞ্চিত করিতেছিল, পতিপ্রাণা পতিব্রতা রমণীর হৃদয় রাজ্য হইতে তাহার রাজাধিরাজকে কাড়িয়া লইয়া যে শয়তানী আপনার অধিপত্য বিস্তার করিয়া বসিয়াছিল, সে পাপ স্বেচ্ছায় বিদায় হইয়াছে, এ সংবাদে দুর্গা যার পর নাই আনন্দিত হইয়াছিল। কাহার না হয়? দুর্গা রক্ত মাংস গঠিত মানবী তো বটে! কিন্তু নলিনীকে কাঁদিতে দেখিয়া সে আর স্থির থাকিতে পারিল না। ভগবান রামকৃষ্ণের চরণোদ্দেশে শত শত প্রণাম করিয়া সে মন বাঁধিল; নশ্বর জীবনের সমস্ত সুখ, সমস্ত সাধ, সমস্ত আহ্লাদ বিলাইয়া দিয়া, ক্ষুদ্র স্বার্থের মস্তকে পদাঘাত করিয়া, সে নলিনীকে বলিল, “সে অভিমান করিয়া চলিয়া গিয়াছে, তুমি ডাকিলেই আবার আসিবে। আমি বেশ জানি সে তোমায় ভালবাসে। তা না হইলে মাকে পর করিয়া, থিয়েটার ছাড়িয়া,

সে তোমার আশ্রয়ে অসিত না। তুমি একবার তাহার সহিত দেখা করিয়া, প্রাণের ব্যথা জানাইয়া, দুটো মিষ্ট কথা বলিলেই সে আর স্থির থাকিতে পারিবে না। তুমি যাও তাহাকে ডাকিয়া আনিয়া আবার সুখী হও! আমার জন্য ভাবিও না— তোমার সুখেই আমার সুখ, তোমার আনন্দই আমার আনন্দ, তোমার তৃপ্তিতেই আমার তৃপ্তি। তোমায় কেহ পর করিতে পারিবে না। আমি তোমার পদ সেবার দাসী, চিরদিন দাসীই থাকিব। ভগবান রামকৃষ্ণের পট তুমিই আমায় আনিয়া দিয়াছিলে, তুমিই আমায় পূজা করিতে শিখাইয়াছিলে। দুর্গা কালী, জগদ্ধাত্রী, সকলের পূজা ছাড়িয়া এখন আমি রামকৃষ্ণের পূজা সার করিয়াছি। তাঁহার শপথ করিয়া বলিতেছি, তুমি যাহাতে সুখী হও, তাহাই কর; আমার কোনও দুঃখ নাই।"

অভিনেত্রীর রূপ হইতে আমরা যে দুই স্থান তুলিয়া দিলাম, তাহা হইতেই আমাদের পাঠক পাঠিকাগণও অমরেন্দ্রনাথের পত্নীর চরিত্রের কতকটা আভাস পাইবেন। এমন যাঁহার পত্নী তিনি কি জীবনে কখনও অসুখী হইতে পারেন! তাহাহইলেই বলিতে হয় যে নানা গুরুতরবিপদে পড়িলেও অমরেন্দ্রনাথ কখনও অসুখী ছিলেন না,—নিজে আনন্দ করিয়া, সহচরদিগকে আনন্দ দিয়া মহা-সুখেই চলিয়া গিয়াছেন। তিনি নটনাথের আশীর্ব্বাদ লইয়া

জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, আবার নটনাথের আশীর্ব্বাদ লইয়াই চির বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

সহস্র দোষ সত্ত্বেও অমরেন্দ্রনাথের হৃদয়ে প্রগাঢ় মাতৃ-ভক্তি ছিল। তাঁহার মাতাও অন্যান্য পুত্র অপেক্ষা তাঁহাকেই অধিকতর স্নেহ করিতেন। তাঁহার যদি কখনও কিছু প্রয়োজন হইত তিনি তাঁহার অন্যান্য পুত্রদিগকে না জানাইয়া অমরেন্দ্রনাথকেই জানাইতেন। অমরেন্দ্রনাথও জননীর প্রয়োজন সম্পন্ন করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া পড়িতেন।

অমরেন্দ্রনাথ কেবল যে একজন প্রতিভাবান্ অভিনেতা ছিলেন তাহা নহে, তিনি বহুসংখ্যক গ্রন্থও রচনা করিয়াছিলেন। অমরেন্দ্রনাথের গ্রন্থগুলি সাহিত্য হিসাবে বিশেষ স্থান লাভ করিতে না পারিলেও, নাট্যামোদী সুধীবৃন্দ তাঁহার যখনই যে কোন গ্রন্থ যে কোন রঙ্গালয়ে অভিনীত হইত তখনই তাহা বিশেষ আগ্রহের সহিত গ্রহণ করিতেন. কেন না তাহারা সুমার্জিত সৎ-সাহিত্য না হইলেও ব্যক্তিগত জীবনের অবিকল জীবন্ত চিত্র প্রতিফলিত করিত। যখনই অমরেন্দ্রনাথের নূতন একখানি গীতিনাটিকা বা প্রহসন রঙ্গালয়ে অভিনীত হইত তখনই দর্শকের ভীড়ে রঙ্গালয়ে আর তিল ধরিবার স্থান থাকিত না। অমরেন্দ্রনাথ যখন ক্লাসিক থিয়েটারের অধ্যক্ষ ছিলেন তখন তিনি নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি রচনা করেন :—১। শ্রীরাধা, ২। শ্রীকৃষ্ণ, ৩। হরিরাজ, ৪।

থিয়েটার, ৫। এস যুবরাজ, ৬। দোললীলা, ৭। শিবরাত্রি, ৮। কাজের খতম, ৯। মজা ১০। ফটিক জল ১১। চাবুক। ১২। নির্ম্মলা, ১৩। তুটী প্রাণ, ১৪। ভক্তবিটেল।

উপরিলিখিত সমস্ত পুস্তক গুলিই ক্লাসিক থিয়েটারে মহা সমারোহে অভিনীত হইয়াছিল।

ইহা ব্যতীত তিনি ক্লাসিকে থাকিতে বঙ্কিম চন্দ্রের সীতারাম, ইন্দিরা, ভ্রমর, যুগলাঙ্গুরীয়, দেবী চৌধুরাণী, রায় সাহেব হারাণ চন্দ্র রক্ষিতের বঙ্গের শেষবীর, শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রণয় পরিণাম, শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের চোখের বালি প্রভৃতি পুস্তকাবলি নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া উক্ত থিয়েটারে অভিনীত করাইয়াছিলেন। ক্লাসিক থিয়েটার পরিত্যাগ করিয়া যখন তিনি গ্রাণ্ড থিয়েটার খোলেন তখন (১৫) "ঘুঘু" নামক একখানি প্রহসন রচনা করেন, এবং ঐ প্রহসন খানি গ্রাণ্ড থিয়েটারে মহাসমারোহে অভিনীত, হয়। তিনি মিনার্ভা থিয়েটারের যখন অধ্যক্ষ হইয়াছিলেন তখন (১৬) "দলিতা ফনিণী" নামক একখানি গীতি নাট্য রচনা করেন। এই গীতি নাটকখানি মিনার্ভা থিয়েটারে মহাসমরোহে অভিনীত হইয়াছিল। তিনি যখন গ্রেট ন্যাশনাল থিয়েটার খোলেন তখন (১৭) জীবনে মরনে" ও (১৮) "আহামরি" নামক একখানি গীতিনাটিকা ও একখানি প্রহসন রচনা করেন। এই তুইখানি পুস্তক লইয়াই গ্রেট ন্যাশানাল থিয়েটারের উদ্বোধন

হয়। তিনি ষ্টারের জন্য নিম্নলিখিত পুস্তকগুলি রচনা করেন, (১৮) রোক শোধ, (১৯) প্রেমের জেপ্‌লিন' (২০) কিশমিস। ইহা ব্যতীত কামিনী কাঞ্চন ও রাণী ভবাণী, জীবনসন্ধ্যা কমলাকান্ত, প্রেমের বাঁধন নামক পুস্তকগুলি নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া অভিনীত করেন।

অমরেন্দ্রনাথ শুদ্ধ নাটক, গীতি নাটক ও প্রহসন রচনা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না, তিনি দুইখানি উপন্যাস এবং একখানি গীতি কাব্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। উপন্যাস দুইখানির নাম (২১) আদর ও (২২) অভিনেত্রীর রূপ। গীতি কাব্যখানির নাম (২৩) নির্ম্মলা। তিনি তিনখানি সাময়িক পত্রিকা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বাল্যকালে অমরেন্দ্রনাথ একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করিয়াছিলেন; তাহার নাম দিয়াছিলেন "সৌরভ।" "সৌরভ" অতি অল্পদিন মাত্র সাহিত্য-উদ্যানে "সৌরভ" বিতরণ করিয়া বন্ধ হইয়া যায়। তাহার পর যৌবনে রঙ্গালয় নামক একখানি সপ্তাহিক পত্রিকা বাহির করেন। জীবনের শেষভাগে তিনি নাট্য মন্দির নামে একখানি মাসিক পত্রিকা বাহির করেন। ইহা ব্যতীত তাঁহার মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি একখানি নাটক লিখিয়া শেষ করেন। মহাবীর নেপোলিয়ানের জীবন-কাহিনী লইয়া, তিনি এই নাটকখানির প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই নাটকখানি লিখিয়া শেষ করিবার পরই তাঁহার মৃত্যু হয়। কাজেই ইহা কোন

রঙ্গালয়ে অভিনীতও হয় নাই, ছাপার অক্ষরে মুদ্রিতও হয় নাই। তিনি শৈশবে দুইখানি পুস্তক প্রকাশ করেন, উষা ও মানকুঞ্জ।

অমরেন্দ্রনাথ চলিয়া গিয়াছেন কিন্তু তাঁহার প্রতিভা চিরদিন তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। তিনি নট ছিলেন বটে,—বারবালা-সংস্রবে তাঁহার চরিত্র কলুষিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু তাঁহার প্রাণ চিরদিনই সজীব ছিল। পরের দুঃখে সতত তাঁহার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিত। দীন দুঃখীকে তিনি যে কত প্রকারে সাহায্য করিয়াছেন তাহা লিখিয়া শেষ করা যায় না। শীতকালে শেষ রাত্রে ক্লাসিক থিয়েটার ভাঙ্গিবার পর অমরেন্দ্রনাথ এক দিন বাড়ী ফিরিতেছিলেন, সেই সময় দেখিলেন পথের পার্শ্বে ফুট-পাথের উপর বসিয়া একটী স্ত্রীলোক ঠক্ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছে। স্ত্রীলোকটীর গাত্রে কিছুই নাই, পরিধানে যে বস্ত্রখানি আছে সেখানিও শত-গ্রন্থি,—তাহার দ্বারা গাত্র ঢাকিবার উপায় নাই। এই দৃশ্যে অমরেন্দ্রনাথের প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। তাঁহার সম্মুখে গাড়ীতে যে বসিয়াছিল তিনি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "এ স্ত্রীলোকটী কে? কেন এই দারুণ শীতে বিনা গায়ের কাপড়ে কাঁপিতেছে?"

সেই লোকটা হাসিতে হাসিতে বলিল, "বাবু ও একটা পাগ্‌লী।"

অমরেন্দ্রনাথ কোচম্যানকে গাড়ী থামাইতে বলিলেন। তিনি একটি কথাও না বলিয়া গায়ের শালখানি খুলিয়া সেই স্ত্রীলোকের

গায়ের উপর ফেলিয়া দিলেন। স্ত্রীলোকটী শালখানি পাইয়া একবার অমরেন্দ্রনাথের দিকে চাহিল,—বলিল, "বাবা বেঁচে থাক।" তাহার পর গায়ের কাপড়খানি সর্ব্বাঙ্গে জড়াইল। অমরেন্দ্রনাথ আর কোন কথা না বলিয়া গাড়ী হাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন।

এরূপ ঘটনা অমরেন্দ্রনাথের জীবনে বহুবার ঘটিয়াছে। তিনি যে দয়ার সাগর ছিলেন এ কথা তাঁহার শত্রু মিত্র সকলকেই এক বাক্যে স্বীকার করিতে হইবে। তাঁহাকে যে যাহাই চাহিয়াছে তিনি তখনই তাহাই তাহাকে প্রদান করিয়াছেন। অমরেন্দ্রনাথের ন্যায় উচ্চ প্রাণ প্রশস্ত হৃদয় সত্যই বাঙ্গালা দেশে বিরল।

অষ্টম উল্লাস।

—*—

অকালে দীপ নির্ব্বাণ।

পত্নী বিয়োগের পর হইতেই অমরেন্দ্রনাথের শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে। মোহের জাল ছিঁড়িয়া যেমনই তিনি বাহিরে আসিলেন, যেমনই ভাবিলেন এইবার পত্নীকে সুখী করিবার চেষ্টা করিবেন,—

শান্তির সংসার পাতিবেন, অমনি তাঁহার পত্নী তাঁহাকে ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেলেন। অমরেন্দ্রনাথ মনে যে আকাশকুসুম রচনা করিয়াছিলেন, কালের একটী আঘাতে তাহা ভাঙ্গিয়া চূরিয়া একেবারে শত খণ্ড হইয়া গেল। পত্নী-বিয়োগে অমরেন্দ্রনাথ হৃদয়ে যে আঘাত পাইয়াছিলেন সেরূপ আঘাত তিনি পূর্ব্বে আর কখনও পান নাই। অমরেন্দ্রনাথের সে তেজ, সে উদ্যম, সে উৎসাহ কিছুই আর রহিল না। তিনি যেন কেমন জড়পিণ্ডের মত হইয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে নানারূপ ব্যাধি আসিয়া পুনরায় তাঁহার দেহ আশ্রয় করিল।

পত্নী বিয়োগের প্রথম আঘাতটা একটু সহ্য হইয়া আসিবার পর অমরেন্দ্রনাথ পুনরায় স্বাস্থ্য লাভ করিবার জন্য ঔষধ সেবন করিলেন, কিন্তু ঔষধে বিশেষ কোন ফললাভ হইল না। পত্নী-বিয়োগের পর সেই আঘাতটা সামলাইবার জন্য তিনি সুরার মাত্রা বাড়াইয়া দিয়াছিলেন। এক্ষণে যদিও ডাক্তারের পরামর্শে সুরার মাত্রাটা একটু কমাইতে বাধ্য হইলেন বটে, কিন্তু একেবারে ছাড়িতে পারিলেন না, কাজেই ব্যাধির হস্ত হইতেও তিনি পরিত্রাণ পাইলেন না। মারাত্মক উদরী রোগে দিন দিন তাঁহাকে ক্ষয় করিতে লাগিল। ডাক্তারি চিকিৎসায় মাঝে মাঝে তিনি একটু সুস্থ বোধ করিতেন বটে, কিন্তু আবার রোগ প্রচণ্ড মূর্ত্তিতে দেখা দিত। এইভাবে তখন তাঁহার দিনগুলি কাটিতেছিল। তথাপি তিনি

থিয়েটার ছাড়িলেন না। অত বড় একটা রোগ দেহে থাকা সত্ত্বেও প্রতি সপ্তাহেই অভিনয় করিতে লাগিলেন। কাজে কাজেই রাত্রি জাগরণ এক দিনের জন্যও বন্ধ হইল না। এত অত্যাচার ভগ্ন দেহ সহ্য করিতে পারিবে কেন? শরীর যখন একেবারে অপটু হইয়া পড়িল তখন তিনি কাশীধামে বায়ু পরিবর্ত্তনের জন্য গমন করিলেন। কাশীধামে যাইয়া কবিরাজি চিকিৎসায় তাঁহার ব্যাধির প্রকোপটা কিছু কমিল। যে কবিরাজ মহাশয় তাঁহাকে চিকিৎসা করিতেছিলেন, তিনি অমরেন্দ্রনাথকে ভরসা দিয়াছিলেন যে, যদি তিনি অন্ততঃ দুই মাস কালও তাঁহার চিকিৎসাধীন থাকেন তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই তাঁহাকে রোগমুক্ত করিবেন। কিন্তু বিধিলিপি অন্যরূপ। অমরেন্দ্রনাথ দুই মাসও তাঁহার চিকিৎসাধীনে থাকিতে পারিলেন না। হঠাৎ চুণি বাবুকে লইয়া গোলযোগ উপস্থিত হওয়ায় তিনি বাধ্য হইয়া কাশী পরিত্যাগ করিলেন।

অমরেন্দ্রনাথ চুণি বাবুর উপর থিয়েটারের ভার অর্পণ করিয়া কাশী গিয়াছিলেন। সহসা তিনি চুণিবাবুর এক পত্রে সংবাদ পাইলেন যে শ্রীযুক্ত মনোমোহন পাঁড়ে তাঁহাকে অধিক বেতন দিয়া তাঁহার থিয়েটারে গ্রহণ করিতে চান। এ বিষয়ে তাঁহার মতামত কি? অমরেন্দ্রনাথ এই পত্র পাইয়া চুণি বাবু সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করিলেন না,—বা তাঁহার বিষয় একটু বিবেচনাও করিলেন না। কাজেই বাধ্য হইয়া চুণি বাবুকে ষ্টার থিয়েটার ছাড়িয়া দিতে হইল।

অমরেন্দ্রনাথ যথাসময়ে সংবাদ পাইলেন যে চুণি বাবু ষ্টার থিয়েটার ছাড়িয়া দিয়া মনোমোহন থিয়েটারে যোগদান করিয়াছেন। এ সংবাদ পাইয়া অমরেন্দ্রনাথ আর কাশীতে এক দণ্ডও থাকিতে পারিলেন না, তখনই কলিকাতা রওনা হইলেন। এ সম্বন্ধে শ্রীযুক্ত মণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন নিম্নে তাহা আমরা উদ্ধৃত করিলাম। মণি বাবু লিখিয়াছেন—

"বৎসরাবধি অমরেন্দ্রনাথের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইয়াছিল। তিনি উদরী রোগে আক্রান্ত হইয়া ভুগিতেছিলেন। মধ্যে মধ্যে কখনও বা সুস্থ থাকিতেন। এবার পূজার পর হইতেই তাঁহার রোগ কিছু বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পূজার পর তিনি বারাণসীধামে গমন করিয়াছিলেন। বসুমতীর সুযোগ্য অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রস্তাবে স্বনামখ্যাত বহুদর্শী কবিরাজ উমাচরণ কবিরত্ন মহাশয় অমরেন্দ্রনাথের চিকিৎসার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। কবিরত্ন মহাশয় অমরেন্দ্র-নাথকে বলিয়াছিলেন,—"যদি আপনি অন্ততঃ দুই মাস কাল আমার চিকিৎসাধীনে থাকেন, আমি আপনাকে আরোগ্য করিতে সমর্থ হইব।" এই সময় কাশীধামে প্রচারিত হইয়াছিল, অমরেন্দ্রনাথের ষ্টার থিয়েটার সম্প্রদায় কাশীধামে অভিনয় করিতে আসিতেছে। কাশীবাসী অত্যন্ত আনন্দিত হইয়াছিলেন। কলিকাতা হইতে সম্প্রদায় আনিয়া কাশীধামে অভিনয় করিবার বাসনা অমরেন্দ্র-নাথেরও প্রবল ছিল। কিন্তু রোগের প্রভাবে তাঁহার বাসনা কার্য্যে

পরিণত নাই। এই সময় অমরেন্দ্রনাথ কবিরাজ মহাশয়কে বলিয়াছিলেন,—কবিরাজ মহাশয়, আপনি আমাকে রোগমুক্ত করিয়া দিন, আরোগ্য হইলে আমি আমার নাট্য সম্প্রদায় কাশীধামে আনিয়া সমগ্র কাশীবাসীকে বিনা টিকিটে থিয়েটার দেখাইব। কবিরাজ মহাশয় বলিয়াছিলেন,—আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনার রোগ চিকিৎসার অতীত নয়। ইহা অপেক্ষাও কঠিন রোগ আমি আরোগ্য করিয়াছি। আপনি কেবল কলিকাতার ভাবনা ত্যাগ করিয়া কিছু দিন আমার চিকিৎসাধীনে থাকুন। অমরেন্দ্রনাথ সম্মত হইয়া বিচক্ষণ কবিরাজ মহাশয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন।”

“এই সময়ে আমরাও বারাণসীধামে ছিলাম। অমরেন্দ্রনাথ প্রায়ই আমাদের বাসায় আসিতেন। কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসাধীনে দুই তিন দিন থাকিবার পরই যেন একটু উপকার দেখা দিল। অমরেন্দ্র-নাথ আমাদের বলিতেন,—আমার মন বলিতেছে,—আমি এই বিচক্ষণ কবিরাজের চিকিৎসাধীনে থাকিয়া নিশ্চয়ই আরোগ্য লাভ করিব। আজ কয়দিন যেন বেশ একটু স্ফূর্ত্তি পাইতেছি। কবিরাজ মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র শ্রীমান বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য সদা সর্ব্বদা অমরেন্দ্র-নাথের তত্ত্ব লইতেন। তিনি বলিতেন,—আপনি বিখ্যাত নাট্য-রথী,—সুদূর কাশীধামে থাকিয়াও আমরা আপনার নাম শুনিয়া থাকি ; আপনাকে আরোগ্য করা আমরা আমাদের কর্ত্তব্য বলিয়া

মনে করি; সুতরাং এ বিষয়ে আমাদের অনুষ্ঠানের কিছুমাত্র ত্রুটী হইবে না।

অমরেন্দ্রনাথ বারাণসী ধামে কবিরাজ মহাশয়ের চিকিৎসাধীনে রহিলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে চুণিলাল দেব বিশেষ দক্ষতার সহিত ষ্টার থিয়েটার চালনা করিতেছিলেন। এই সময় মনোমোহন থিয়েটারের কর্ত্তৃপক্ষগণ চুণি বাবুকে আহ্বান করিলেন—তাঁহাকে উক্ত রঙ্গালয়ের অন্যতম অংশিরূপে গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করিলেন। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি চুণি বাবু এ সম্বন্ধে অমর বাবুর অভিমত জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ যদি এ সময় চুণি বাবুর সম্বন্ধে কিছু একটু বিবেচনা করিতেন, তাহা হইলে চুণিবাবু কখনও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া মনোমোহন থিয়েটারে যোগদান করিতেন না। আমরা জানি, প্রথমে অমরেন্দ্রনাথ চুণি বাবুর সহিত একটা নূতন বন্দোবস্ত করিবার বাসনা করিয়াছিলেন, কিন্তু অমরেন্দ্রনাথের কতকগুলি 'হিতৈষী' (?) সে বাসনার বিশেষ প্রতিবন্ধক হইয়াছিলেন। অমরেন্দ্রনাথের এই শ্রেণীর 'হিতৈষীর' সংখ্যা বড় কম ছিল না। অমরেন্দ্রনাথ মনে মনে যে সঙ্কল্প করিতেন, এই হিতৈষীর দল যদি দেখিতেন, সে সঙ্কল্প তাঁহাদের স্বার্থের অনুকূল নহে, তাঁহারা তখনই অমনি দল পাকাইয়া, রীতিমত রিহারসেল দিয়া সেই সঙ্কল্পের বিরুদ্ধে নানাবিধ যুক্তি-তর্ক তুলিয়া তাহা পণ্ড করিয়া দিতেন। শ্রীযুক্ত চুণিলাল দেব ষ্টার

থিয়েটারের পরিচালনার ভার প্রাপ্ত হওয়ায় এই সকল হিতৈষীর অনেক প্রভাব প্রতিপত্তি ও খর্ব্ব হইয়া পড়ে, তাঁহারা মনে মনে প্রমাদ গণিতে থাকেন। কর্ত্তব্যনিষ্ঠ চুণি বাবু তাঁহাদিগের অনেককেই মনঃক্ষুণ্ণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহারা বারাণসী ধামে অমরেন্দ্র-নাথকে স্বতন্ত্রভাবে পত্রযোগে মন্ত্রণা দিতে লাগিলেন,—নানাবিধ অলীক প্রসঙ্গ তুলিয়া অমরেন্দ্রনাথের মন ভারাক্রান্ত করিলেন, বিশেষরূপে অমরেন্দ্রনাথকে বুঝাইয়া দিলেন যে, অমরেন্দ্রনাথ বর্ত্তমান সমগ্র নাট্য-জগতের ভাগ্যবিধাতা। থিয়েটারের অজস্র টিকিট বিক্রয় ও অশেষ প্রতিপত্তি সকলই একমাত্র তাঁহারই ভাগ্য ও নামের নিমিত্ত। সুতরাং তিনি যদি এখন চুণি বাবুর সহিত নূতন কিছু বন্দোবস্ত করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে আর থিয়েটার না করাই কর্ত্তব্য। অমরেন্দ্রনাথ অত্যন্ত অধৈর্য্য পুরুষ ছিলেন, কোন বিষয়েই কোন দিন তাঁহার ধৈর্য্য ছিল না। তিনি কলিকাতায় ফিরিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিলেন। কবিরাজ মহাশয় তাঁহাকে বিশেষভাবে নিবারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—কলিকাতায় গিয়া অতি সত্বর থিয়েটার সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা করিয়া সপ্তাহের মধ্যে ফিরিয়া আসিব। কবিরাজ মহাশয় এক সপ্তাহের ব্যবহারোপযোগী ঔষধও দিয়াছিলেন, কিন্তু বোধ হয় তাহা আর ব্যবহৃত হয় নাই।

যাইবার দিন অমরেন্দ্রনাথ আমাদের বাসায় আসিয়াছিলেন।

সে দিন আমাদের বাসায় তাঁহার নিমন্ত্রণ ছিল। আমাদের বাসার অনতিদূরেই শ্রদ্ধাস্পদ নাট্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু মহাশয়ের বাসা। নাট্যাচার্য্য মহাশয় অসুস্থতা নিবন্ধন বহুদিন যাবৎ বারাণসী ধামে অবস্থান করিতেছিলেন। বেলা দশটার সময় স্নানাদি করিয়া অমরেন্দ্রনাথ অমৃতবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেলেন। যাইবার সময় বলিয়া গেলেন,—"অমৃত বাবু বাসাতে ডাকিয়াছেন,—চুণি বাবুও যাইতেছেন, সেই সম্বন্ধে আমরা তাঁহার সহিত পরামর্শ করিব।" দুই ঘণ্টা পরে অমরেন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিলেন। তখন তাঁহার মুখ বেশ প্রফুল্ল, ভাবিলাম, অমৃতবাবুর নিকট নিশ্চয়ই সুপরামর্শ পাইয়াছেন। তাই এই আনন্দ। আমাকে বলিলেন, "অমৃত বাবুকে বলিলাম যে, চুণি বাবু চলিয়া যাইতেছেন, আমার শরীরেরও এই অবস্থা, এখন আপনার সাহায্য ভিন্ন থিয়েটারটীকে রক্ষা করিবার কোনই উপায় দেখিতেছি না। এখন যদি আপনি আমাকে সাহস দেন—আমি সম্পূর্ণ আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত কলিকাতায় গিয়া থিয়েটারের পরিচালনা ভার গ্রহণ করেন, তাহা হইলেই মঙ্গল, নতুবা আমাকে বাধ্য হইয়া থিয়েটারের সকলকেই ছাড়িয়া দিতে হয়,—কারণ আমার শরীর একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে।"

"আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"তিনি কি বলিলেন ?" অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন,—আমি যাহা প্রত্যাশা করি নাই, তিনি তাহা করিয়াছেন। তিনি বলিলেন—"আমি যদিও এখনও সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারি নাই,

যদিও কাশীধাম হইতে এখন কিছুদিন কলিকাতায় ফিরিবার বাসনা আমার ছিল না, কিন্তু তুমি যখন বিপন্ন এবং তোমার শরীর যখন ভগ্ন, তোমার জন্য, তুমি আরোগ্য না হওয়া পর্য্যন্ত, আমি সকল প্রকারেই তোমাকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত আছি।" তাহার পর অমরেন্দ্রনাথ বলিলেন, "আমি বলিয়া আসিয়াছি, কলিকাতায় গিয়াই তাঁহাকে পত্র লিখিব, আমার পত্র পাইলেই তিনি কলিকাতায় যাইবেন বলিয়াছেন।"

সেই দিনই অমরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় চলিয়া আসেন। কিন্তু কলিকাতায় আসিয়াই সম্ভবতঃ তাঁহার মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। কারণ চুণিবাবুর প্রভাবে অমরেন্দ্রনাথের যে সকল "হিতৈষীর" স্বার্থহানি হইতেছিল, তাঁহারা প্রত্যেকেই থিয়েটারের এক একটী "ভুষণ্ডী"। কোন অধ্যক্ষের কি প্রকৃতি—কাহার কোথায় দুর্ব্বলতা—কোন দেবতা কি প্রকার তোষামোদে প্রসন্ন হন—তাঁহারা তাহা বিশেষই জানিতেন। প্রাচীন নাট্যাচার্য্য স্থির গম্ভীর অমৃতলালের কঠোর শাসনাধীনে স্বার্থসাধনের আশা নাই,—ইহা বোধ হয় তাঁহারা বুঝিয়াছিলেন এবং সম্ভবতঃ তাই রোগগ্রস্ত অমরেন্দ্রনাথকে প্রলুব্ধ করিয়া আর কাহাকেও আনাইবার অবকাশ না দিয়া তাহাকে আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন।"

কাশী হইতে অমরেন্দ্রনাথ ফিরিয়া আসিয়া আবার অভিনয় করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। কাশী হইতে আসিবার সময়

ভাবিয়াছিলেন যে তিনি কেবলমাত্র কয়েক দিন কলিকাতায় থাকিবেন। কিন্তু কলিকাতায় আসিবার পর তাঁহার সে মত পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। সেই পীড়িত অবস্থায়ই তিনি আবার থিয়েটারের সমস্ত ভার গ্রহণ করিলেন। সওদাগর নামক একখানি নাটক বহুদিন হইতে রিহার্সলে পড়ি পড়ি করিয়াও নানা কারণে পড়ে নাই। অমরেন্দ্রনাথ কলিকাতায় আসিয়াই তাহার রিহার্সল আরম্ভ করিয়া দিলেন। নাটকখানি যাহাতে দর্শকগণের মনোরঞ্জন করিতে পারে তাহার জন্য অমরেন্দ্রনাথ দিবারাত্রি পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। রিহার্সল সম্পূর্ণ হইবার পর "সওদাগর" নাটক মহাসমারোহে ষ্টারে অভিনীত হইতে আরম্ভ হইল। এই নাটকে তিনি কুলীরকের ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং ভূমিকাটী যতদূর সুন্দর অভিনয় হওয়া সম্ভব তাহা তিনি করিয়াছিলেন। সওদাগর নাটক অভিনয় হইবার সঙ্গে সঙ্গে বড় দিনের জন্য "গোঁসাইজীর" মহালা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। এই পুস্তকখানি রিহার্সল দিতেও তাঁহারও কম পরিশ্রম হয় নাই।

এদিকে যতই অত্যাচার বাড়িতেছিল রোগও ততই তাঁহাকে পঙ্গু করিয়া ফেলিতেছিল। ২৫শে অগ্রহায়ণ শনিবার—সেই দিনই অমরেন্দ্রনাথের শেষ অভিনয়। ইহার পর আর তাঁহাকে অভিনয় করিতে হয় নাই। শনি রবিবারের বিজ্ঞাপন পূর্ব্বেই বাহির হইয়া গিয়াছিল কাজেই অমরেন্দ্রনাথকে রোগসত্ত্বেও ঔরঙ্গজেবের

ভূমিকায় নামিতে হইয়াছিল। তৃতীয় অঙ্কে অভিনয় করিতে করিতে তাঁহার মুখ দিয়া ভলকে ভলকে রক্ত উঠিতে লাগিল। সুতরাং আর তিনি অভিনয় করিতে পারিলেন না। শরীর নিতান্ত অসুস্থ হইয়া পড়ায় সোমবার ষ্টীমারযোগে সুন্দর বন হইয়া তিনি গোয়ালন্দ যাত্রা করিলেন। তিনি যে দিন গোয়ালন্দ উপস্থিত হন, সেই দিন তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ধীরেন্দ্রনাথের মৃত্যু হয়। পীড়িত অবস্থায় অমরেন্দ্রনাথ ভ্রাতৃবিয়োগের এই নিদারুণ সংবাদ পাইয়া একেবারে বসিয়া পড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে জ্বরটাও প্রবল হইয়া উঠিল। ইহার পর ৩রা জানুয়ারী পর্য্যন্ত অমরেন্দ্রনাথ এক ভাবেই ছিলেন। কেহ এক দিনের জন্যও ভাবে নাই যে অমরেন্দ্রনাথ আর শয্যা ত্যাগ করিবেন না। ৪ঠা জানুয়ারী হইতে রোগের ভয়ঙ্কর বৃদ্ধি হইল। ডাক্তারেরা মহা ভীত হইয়া পড়িলেন। চিকিৎসার কোনও ত্রুটি হইল না। কিন্তু বিধিলিপি কে খণ্ডাইবে? দশ দিন জীবন ও মৃত্যুর অবিরাম তুমুল সংগ্রামের পর অমরেন্দ্রনাথ মহামুক্তিলাভ করিলেন,—তাঁহার বন্ধুবর্গ, আত্মীয় স্বজন ও গুণমুগ্ধ দর্শকগণকে কাঁদাইয়া দিব্য জ্যোতির্ম্ময় অমরধামে চলিয়া গেলেন। ১৩২২ সালের ২১শে পৌষ বৃহস্পতিবার শেষরাত্রে চারিটা দশ মিনিটের সময় ব্রাহ্মমূহূর্ত্তে বঙ্গরঙ্গভূমির অন্যতম গৌরব অমরেন্দ্রনাথ মহাপ্রস্থান করিলেন। শুক্রবার প্রভাত হইবার সঙ্গে সঙ্গে অমরেন্দ্রনাথ নাই এ কথা সমস্ত সহরময় রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। দলে দলে লোক অমরেন্দ্রনাথকে দেখিবার জন্য ছুটিয়া

আসিতে লাগিল। বেলা নয়টা না বাজিতে বাজিতে অমরেন্দ্রনাথের হাতীবাগানের বাটী লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। বেলা ১১টার সময় অমরেন্দ্রনাথের শবদেহ রাজবেশে সজ্জিত হইয়া হাতীবাগানের বাটী হইতে বাহির হইল। অমরেন্দ্রনাথের শবদেহ প্রথমে ষ্টার থিয়েটারের সম্মুখে, তাহার পর ক্লাসিক থিয়েটারের সম্মুখে, নামান হইল। বেলা প্রায় ১২টার সময় অমরেন্দ্রনাথের শবদেহ নিমতলা ঘাটে আসিয়া উপস্থিত হইল। নিমতলা ঘাট লোকে লোকারণ্য,—অভিনেতা অভিনেত্রীর ক্রোন্দনরোলে সমস্ত শ্মশান ভূমি মুখরিত হইয়া উঠিল। ক্রমে পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ শেষ কার্য্য সম্পূর্ণ করিলেন। অগ্নি ধক্‌ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই সব শেষ হইয়া গেল।

অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার পার্থিব লীলা শেষ করিয়া চিরতরে চলিয়া গেলেন বটে; কিন্তু তিনি যে কীর্ত্তি রাখিয়া গেলেন তাহা চিরদিন ধরার পৃষ্ঠে অঙ্কিত হইয়া থাকিবে। যতদিন বাঙ্গালাদেশে থিয়েটার থাকিবে ততদিন আর কাহাকেও বলিতে হইবে না অমরেন্দ্রনাথ কে ছিলেন। অমরেন্দ্রনাথ চলিয়া গিয়াছেন,—আর দ্বিতীয় অমরেন্দ্রনাথ বঙ্গ রঙ্গালয়ে আসিবে কি না সে কথার মীমাংসা করিতে পারেন শুদ্ধ অন্তর্য্যামী।

সমাপিকা

অমরেন্দ্র-প্রতিভা।

প্রাচ্য ভূখণ্ডে নটব্যবসায় অতি হেয়, সামান্য আফিসের চাকুরী হইতেও নিন্দনীয়। সেই জন্য উচ্চ সম্ভ্রান্ত বংশীয় অভিজাতবৃন্দ অভিনয়-কার্য্যে যোগদানে বিরত। কিন্তু প্রতীচ্য ভূখণ্ডে অভিনয়-ব্যবসায় অন্যান্য ব্যবসায়ের ন্যায় আদরণীয়, অভিজাতগণও নটব্যবসায়ে উদাসীন নহেন। বস্তুতঃ নাট্যানুশীলন ও অভিনয় চর্চ্চা চতুঃষষ্টি ললিত কলার প্রধানতম অঙ্গ। দেবতার ও আর্য্যদের ভারতে ইহাদের সমধিক আদর ও অনুশীলন পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কিরূপে এই সৎ-সাহিত্যানুশীলনীর এতদূর হেয়তা ও নিন্দাস্পদতা লাভ হইয়াছিল তাহা সহৃদয় সুধীমাত্রেরই সবিশেষ অনুধাবনার যোগ্য। দেবর্ষি ভরত পিতামহ ব্রহ্মা ও দেবদেব সদাশিবের নিকট যে পবিত্র কলাবিদ্যায় শিক্ষা লাভ করিয়া দেবতা, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, অপ্সরা প্রভৃতির দ্বারা যাহার পূর্ণ অনুশীলন করাইয়াছিলেন, যাহাকে আর্য্যঋষিগণ পঞ্চম বেদ বলিয়া আখ্যা দিয়াছেন, সেই নাট্যানুশীলন কি কখনও নিন্দিত বা ঘৃণ্য হইতে পারে? তবে যেমন অসৎ কাব্যের ক্রমশঃ প্রসারে সুধীগণ নিতান্ত ভীত ও বিরক্ত হইয়া "কাব্যালাপাংশ্চ বর্জ্জয়েৎ" এই ঘোষণা

প্রচারে বাধ্য হইয়াছিলেন, আমাদের মনে হয়, কালে এইরূপ অসৎ নাট্যাদির প্রচারে এবং অভিনেতা ও অভিনেত্রীর চরিত্রাভাব প্রদর্শনে সহৃদয় সুধীসমাজে নটকুলের নিন্দা এবং নাট্যচর্চ্চার প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন উপস্থিত হইয়াছিল। বস্তুতঃ আর্য্য নাট্যশাস্ত্রেও এইরূপ ইঙ্গিত পরিলক্ষিত হয়। যাহা হউক অসৎ নাট্যগ্রন্থ কিংবা অসাধু অভিনেতার জন্য পবিত্র নাট্যশাস্ত্র ও প্রতিভার প্রধান বিকাশক্ষেত্র অভিনয়-কলা কখনও নিন্দিত কিংবা বিদ্যোৎসাহীর অনাদরের বিষয় হইতে পারে না। সাধু ও অসাধু সর্ব্বত্রই বিদ্যমান। এমন যে পবিত্রতার পূর্ণমূর্ত্তি সন্ন্যাসব্রত—তাহাতেও তো সর্ব্বত্র ভেল দেখিতে পাওয়া যায়, তজ্জন্য কি সন্ন্যাসব্রত কখনও কাহারও নিন্দাহ´?

শিক্ষা তিন প্রকার :—শারীরিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক। এই ত্রিবিধ শিক্ষাই সম্পূর্ণ মনুষ্যত্ব লাভের নিতান্ত প্রয়োজনীয়। চতুঃষষ্টি কলাবিদ্যার প্রধানতম অঙ্গ ললিত নাট্যানুশীলন মানসিক ও আধ্যাত্মিক শিক্ষার শ্রেষ্ঠ উপাদান। জগতের মধ্যে যে জাতিই মানসিক ও আধ্যাত্মিক অনুশীলন প্রভাবে বিশ্ববরেণ্য হইয়াছিলেন বা এখনও বিদ্যমান রহিয়াছেন, জাতীয় নাট্য-সাহিত্যই তাঁহাদের সভ্যতার চরম নিদর্শন। অতি পুরাতন কাল হইতেই নাট্য-সাহিত্যের পরম সমাদর না থাকিলে কবিচূড়ামণি এসকাইলাস, সফোক্লিস, কালিদাস, ভবভূতি, সেক্সপীয়র, বেনজনসন, মোলিয়র, রেসিনি, গেটে প্রভৃতির সকল শিল্প ও বিজ্ঞান সমুদিত

বিশ্বপূজ্য জাতিদিগের মধ্যে এত আদর ও গৌরব দেখা যাইত না; এবং দেবর্ষি ভরত, কোহল ও শাণ্ডিল্য হইতে আরম্ভ করিয়া গ্যারিক, মিসেস সিডনস্, সেরিডন ও স্যার হেন্‌রি আইয়ারভিঙ্গ পর্য্যন্ত অভিনেতৃকুলের এত সম্মান ও বরণীয়তা হইত না। আমাদের বর্ত্তমান নাট্যচর্চ্চা ও রঙ্গালয়ের অভিনয় ইয়ুরোপীয়দিগের অনুকরণে, সুতরাং আমাদের দেশের নাট্যগৌরব ও অভিনেতৃ-সম্মান ইয়োরোপীয় রীতি অনুসারেই পরিবর্দ্ধিত হইবে। কিঞ্চিদূন শতাব্দী পূর্ব্বে যে ডাক্তারী ও পূর্ত্তবিদ্যাকে লোকে নিতান্ত হেয় ও ঘৃণার্হ বলিয়া মনে করিত, এখন তাহা অভিজাত-চূড়ামণিরও পরম আদরের সামগ্রী হইয়াছে। তবে প্রতি কার্য্যই এদেশে প্রথম প্রবর্ত্তনের সময়ে গোড়া অভিজাতগণের নিকটে অশেষ নিন্দা ও ঘৃণা আবাহন করে। পূজ্যপাদ রায় বঙ্কিমচন্দ্রকে ইংরাজীর অনুকরণে নূতন উপন্যাস প্রণয়নে, পূজনীয় পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন ও রায় দীনবন্ধু মিত্রকে অভিনব নাট্যপ্রণয়নে এবং সম্মানার্হ গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর ও অমৃতলালকে নটজীবন-গ্রহণে প্রথমে গোঁড়া বৃদ্ধদের নিকটে অনেক লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা ভুগিতে হইয়াছে। কত শত বঙ্কিমের উপন্যাস গোলদীঘির জলে নিমজ্জিত হইয়াছে উহার সংখ্যা করা যায় না, কত সহস্র মুখে রামনারায়ণ, দীনবন্ধু, গিরিশ-চন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর ও অমৃতলালের নিন্দা ও দুর্নাম সর্ব্বত্র ঘোষিত হইয়াছে উহার পরিমাণ নাই। কিন্তু কাল-স্রোতে আবার গুণের

আদর বাড়িয়া উঠিল। বঙ্কিমচন্দ্র নব্যসম্প্রদায়ের শিরোমণি হইলেন। জগৎ-বরেণ্য বিদ্যাসাগর মহাশয়কে কি বহুবিবাহ সমাজ হইতে রহিত করিতে গিয়া অশেষ লোকের প্রকাশ্য গালি ও নিভৃত প্রহার পর্য্যন্ত সহ্য করিতে হয় নাই?

অমরেন্দ্রনাথের জীবনী সমালোচনায় আমরা দেখিতে পাই যে নাট্যাভিনয়ে জীবন-উৎসর্গই জন্মাবচ্ছিন্ন তাঁহার প্রাণের ঐকান্তিকী বাসনা। সেইজন্য তিনি লেখাপড়ায় পর্য্যন্ত আবাল্য নিতান্ত উদাসীন ছিলেন, কেবল নাট্যসংক্রান্ত বিষয় লইয়াই নিরত থাকিতে ভাল বাসিতেন। এইজন্য তাঁহাকে কত গুরুতর লাঞ্ছনা ও তিরস্কার ভোগ করিতে হইয়াছে, কেননা অভিনয়-অনুশীলন বঙ্গবাসীর চক্ষে অতি হেয়, বিশেষতঃ তাঁহার মত সম্ভ্রান্ত বংশের তরুণের পক্ষে নিতান্ত লজ্জাকর ও অবমাননাজনক। যদি আমাদের দেশে ইয়োরোপ ইত্যাদির ন্যায় স্কুল অব্ এলোকোয়েন্স্ (School of Eloquence) থাকিত, তাহা হইলে তথায় শিক্ষালাভ করিয়া হয়ত অমরেন্দ্রনাথ, পূর্ব্বজন্মের সংস্কারবশতঃ নাট্যাভিনয়ে যেরূপ স্বাভাবিক প্রবীণতা লাভ করিয়াছিলেন, তাহাপেক্ষা সহস্রগুণ পাণ্ডিত্য লাভে বঙ্গে অভিনয়কলা সম্বন্ধে এক অপূর্ব্ব আদর্শ রাখিয়া যাইতে পারিতেন। অভিনয়ের প্রতি তাঁহার এতদূর ঐকান্তিকী আসক্তি ছিল যে তাঁহার বন্ধুদিগের পরামর্শ মত কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়াই নিজের সাধের বিবাহের যৌতুক চেন ও আংটী বন্ধক দিয়া টাকা সংগ্রহ

করিয়া, অভিনেতার সঙ্গে পরিচয় অসম্ভব বলিয়া, অভিনেত্রীর সঙ্গে পরিচয়ের মানসে যাত্রা করিয়াছিলেন। গৃহে আদর্শ পতিব্রতা পত্নী, ভারতবিখ্যাত মহাপণ্ডিত অনুকরণীয়-চরিত্র ভ্রাতা, স্নেহময় জনক-জননী, সমুদয় ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ প্রাণের অভিনয়-পিপাসা মিটাইবার জন্যই কুসঙ্গীদের কুপরামর্শে তাঁহাকে কত শত হেয়, নিন্দনীয় কার্য্যে নিরত থাকিতে হইয়াছে। প্রকৃত চালক থাকিলে ইহার কিছুরই আবশ্যক হইত না। তিনি যে ব্রত উদ্যাপনে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সুনাম ও সুখ্যাতির সহিত তাহা সম্পন্ন করিয়া, সেই অভিনয়-কলার চরম উৎকর্ষ সাধন করিয়া যাইতে পারিতেন। এইরূপে আমাদের দেশে বিবিধ বিদ্যার উন্মেষ ও পরিপূর্ত্তির উপায়ের অভাবে কত কোটি কোটি প্রতিভা যে অকালে করাল কালের কঠোর গ্রাসে নিপতিত হইতেছে তাহা বর্ণনাতীত। আমাদের দেশে বিদ্যার্জ্জন শব্দে শুদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদ্যার্জ্জন ব্যতীত আর কিছুই বুঝা যায় না। চিত্রণ, বয়ন, ভাস্করকার্য্য, অভিনয়, সঙ্গীত, নর্ত্তন, সূচীকার্য্য, সূত্রধারের কার্য্য, কৃষি চালনা প্রভৃতি উচ্চশিক্ষার অঙ্গ বলিয়াই গণ্য নহে। সুতরাং কেহ বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ঘটনাক্রমে উত্তীর্ণ হইতে না পারিলেই, সর্ব্বসমক্ষে সেই ব্যক্তি অকর্ম্মা, ব্যর্থজীবন হইয়া রহিল। সে যেন জগতের সমস্ত কার্য্যেরই বাহিরে। এই জন্যই জগতের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতবর্ষ, বিশেষতঃ বঙ্গভূমি, ঊর্দ্ধে আরোহণে অদ্যাপি সম্পূর্ণ অক্ষম। এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের

শিক্ষিত যুবকগণও কেবল ওকালতী, ডাক্তারি, ইঞ্জিনিয়ারী, মাষ্টারী, ও আফিসের কেরাণীগিরি ব্যতীত কার্য্যান্তরে প্রবেশে অক্ষম হইয়া দারিদ্র্যের করাল কবলে অকালে বিষাদময় জীবনের অবসান করিতেছেন। বিদ্যা যে অনন্ত, তাহার বিষয় যে অপরিসীম, ইহা কাহারও সঙ্কীর্ণ-হৃদয়ে স্থানলাভে অসমর্থ। আবার সংস্কারবশতঃ কেহ যদি সেই সঙ্কীর্ণ গণ্ডীর বাহিরে তাঁহার কর্ম্মকাণ্ড প্রসার করিতে অগ্রসর হন তাহা হইলে চারিদিক হইতে তাঁহার প্রতিকূল চীৎকারে দেশময় মুখরিত হইবে। ফলে সেই নবীন কর্ম্মোদ্যোগী ব্যক্তির কার্য্য নষ্ট হইয়া যায়, আর তাঁহার জীবন নিষ্ফল বিষময় হইয়া সমাজের কণ্টকস্বরূপ হইয়া থাকে। আমাদের বিশ্বাস প্রথম হইতে অমরেন্দ্রনাথ যদি স্বীয় নিসর্গ-প্রণোদনার অনুরূপ ক্ষেত্রে প্রকৃত চালকের দ্বারা পরিচালিত হইতে পারিতেন, তাহা হইলে তিনিও কালে স্বীয় অবিনশ্বর কীর্ত্তিকলাপে বিশ্ব পূর্ণ করিয়া স্বয়ং অক্ষয় অমর প্রাতঃস্মরণীয় হইয়া থাকিতে পারিতেন। তাঁহার নাম উচ্চারণে সকলের নেত্রযুগল হইতে অবিরল অশ্রুপ্রবাহ নির্গত না হইয়া সুধীজন হৃদয় আনন্দে পরিপূরিত ও বক্ষ গৌরবে স্ফীত হইয়া উঠিত।

যাহা হউক অমরেন্দ্রনাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনরূপ শিক্ষা না পাইয়া, অতি কৈশোরে কুসঙ্গীর কুপরামর্শে স্বস্থানচ্যুত হইয়া নানারূপ অপথে চলিয়া, এমন কি তাহার ফলে অকালে অমূল্য

জীবনরত্ন হারাইয়াও, যাহা উপহার স্বরূপ রাখিয়া যাইতে পারিয়াছেন, তাহাতেই বঙ্গবাসী তাঁহাকে কখনও ভুলিতে পারিবেন না।

চল্লিশ বৎসর পূর্ণ হইতে না হইতেই অমরেন্দ্রনাথ ভবধাম পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে তিনি প্রায় ২৯ খানি নাটক ও গীতিনাট্য এবং অনেকগুলি গীতিকবিতা ও একাধিক জীবন্তচিত্রপূর্ণ উপন্যাস রচনা করিয়া বঙ্গবাসীর করকমলে উপহার প্রদান করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত প্রায় ৮।১০ খানি সুপ্রসিদ্ধ উপন্যাস নাটকাকারে পরিবর্ত্তিত করিয়া ও তদুচিত সঙ্গীত রচনা দ্বারা সেইগুলি প্রশংসার সহিত রঙ্গমঞ্চে অভিনয়পূর্ব্বক নিজের প্রবীণ স্বাভাবিক নাট্যকলাকুশলতার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। সর্ব্বশেষে সর্ব্ববিধ অভিনয়-কলা ও থিয়েটার পরিচালনায় অসাধারণ শক্তিমত্তা প্রদর্শনেও নাট্যামোদিমাত্রেরই হৃদয়-কন্দরে পূর্ণ আনন্দ বিধান করিয়া গিয়ছেন। তাঁহার কার্য্যাবলি দর্শনে কে বলিবে যে তিনি বিশ্বলিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন না ?

তৎকৃত গ্রন্থাবলী ও তৎসঙ্গে কোন্ থিয়েটারে উহারা প্রথমে অভিনীত হইয়ছিল তাহার একটী তালিকা পাঠকবৃন্দের কৌতূহল নিবারণের জন্য নিম্নে আমরা প্রদান করিতেছি। *

---

* এই তালিকাটি আমরা অমরেন্দ্রনাথের সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীমান্ হরীন্দ্রনাথ দত্তের নিকট হইতে প্রাপ্ত হইয়া তাহার নিকটে অশেষ কৃতজ্ঞতা-স্বীকারপূর্ব্বক পাঠক সমক্ষে প্রকাশ করিতেছি।

ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত।

১।	হরিরাজ	...	...	নাটক।
২।	শিবরাত্র	...	...	গীতিনাট্য *
৩।	কাজের খতম	...	...	পঞ্চরং।
৪।	নির্ম্মলা	...	...	গীতিনাট্য। †
৫।	মজা	...	...	নক্সা।
৬।	ছুটীপ্রাণ	...	...	গীতিনাট্য।
৭।	ফটিক জল	...	...	নাটিকা।
৮।	থিয়েটার	...	...	পঞ্চরং।
৯।	শ্রীকৃষ্ণ	...	...	গীতিনাট্য।
১০।	শ্রীরাধা	...	...	ঐ
১১।	ভক্তচিটেল	...	...	পঞ্চরং।
১২।	মানকুঞ্জ	...	...	গীতিনাট্য।
১৩।	এস যুবরাজ	...	...	রূপক।
১৪।	চাবুক	...	...	পঞ্চরং।

* ক্লাসিক থিয়েটার খুলিবার পরই যে শিবরাত্রি অর্থাৎ ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের শিবরাত্রিতে প্রথম অভিনীত।

† বাল্যকালে শ্রুত মধুসূদন দাদার ও গুরুমহাশয়ের উপাখ্যান অবলম্বনে নির্ম্মলা বিরচিত। ইহাতে নাট্য সম্পত্ বিশেষ কিছু না থাকিলেও, নগ্ন নিসর্গ-ভাবের বর্ণনা বেশ আছে। কবির প্রথম জীবনের কাহিনীও কিছু কিছু আছে।

১৫। দোললীলা ... ... গীতিনাট্য।

গ্রাণ্ড থিয়েটারে অভিনীত।

১৬। ঘুঘু ... ... পঞ্চরং।

১৭। বঙ্গের অঙ্গচ্ছেদন ... ... রূপক।

(দ্বিতীয়বার আগমনের পর ক্লাসিক থিয়েটারে অভিনীত)।

১৮। প্রণয় না বিষ? ... ... নাটক।

মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত।

১৯। দলিতা ফণিনী ... ... নাটিকা।

ষ্টার থিয়েটারে অভিনীত।

২০। কেয়া মজাদার ... ... রঙ্গনাট্য।

২১। আশা কুহকিনী ... ... নাটিকা।

গ্রেট ন্যাসেনালে অভিনীত।

২২। জীবনে মরণে ... ... নাটিকা।*

২৩। আহামরি ... ... পঞ্চরং।

দ্বিতীয়বার ষ্টার থিয়েটারে গমনের পর অভিনীত।

২৪। কিস্‌মিস্‌ ... ... রঙ্গনাট্য।

২৫। রোকশোধ ... ... রঙ্গনাট্য।

---

* কবিকুলরবি শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের 'দলিয়া' নামক গল্প অবলম্বনে বিরচিত।

২৬। বড় ভালবাসি ... ... গীতিনাট্য।

২৭। প্রেমের জেপলিন ... ... রঙ্গনাট্য

বালরচনা (কোন থিয়েটারে অভিনীত হয় নাই)।

২৮। উষা ... ... গীতিনাট্য।

শেষ রচনা (অদ্যাপি কোন থিয়েটারে অভিনীত হয় নাই)

২৯। নেপোলিয়ন বোনাপার্ট ... নাটিকা।

উপন্যাস।

১। আদর।   ২। অভিনেত্রীর রূপ।

উপরিপ্রদত্ত অমরেন্দ্রনাথের বিরচিত গ্রন্থাবলীর তালিকা দৃষ্টে আমরা দেখিতে পাই, তিনি নাট্যসাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গেই হস্তামর্শন করিয়াছিলেন। হরিরাজের ন্যায় গুরুভাবাপন্ন নাটক হইতে চাবুকের ন্যায় সমাজ শিক্ষার জ্বলন্ত পঞ্চরং পর্য্যন্ত রচনায় সর্ব্বত্র তাঁহার অপ্রতিহত শক্তি প্রকটিত। ইহাদিগের মধ্যে কাজের খতমের মতিলাল চরিত্রে, চাবুকের প্রিয়লাল চরিত্রে, মজার হরিহর চরিত্রে, সর্ব্বোপরি অভিনেত্রীর রূপে নলিনী চরিত্রে, কবি তাঁহার স্বীয় জীবন প্রতিফলিত করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ঘুঘুতে, যাহাদের চক্রান্তে তাঁহার বক্ষঃ-শোণিতের তুল্য আদরের ক্লাসিক থিয়েটার উঠিয়া গিয়াছিল, তাহাদের অবিকল জীবন্ত চিত্র প্রকটিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার প্রণীত কোন পঞ্চরংই কল্পিত চরিত্র অবলম্বনে প্রণীত

নহে। তৎ-প্রণীত শুদ্ধ এই চরিত্রগুলির পাঠেই বেশ পরিস্ফুট হইবে যে কবির জীবনের লক্ষ্য কি মহৎ ছিল, কিন্তু কিরূপে নিজের বয়স্তারুণ্যে ও অনভিজ্ঞতায় কুসঙ্গীর কুপরামর্শে পরিচালিত হইয়া সত্য মনে করিয়া অসত্যের আশ্রয়ে তাঁহার জীবন বিপথগামী হইয়াছিল, কিরূপ আমরণ তাঁহাকে তজ্জন্য সন্তপ্ত থাকিতে হইয়াছে। জীবনের এরূপ জ্বলন্ত ছবি অন্য কোনও কবির লেখনী মধ্যে পরিলক্ষিত হয় না। কবিবর তদ্‌বিরচিত আদর উপন্যাসেও শ্যামাচরণের চরিত্রে নিজের জীবনের দুর্ব্বলতাগুলি বেশ ফুটাইয়া চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। অমরেন্দ্রনাথ প্রকৃতই কবি ছিলেন, তাই প্রকৃত কবির ন্যায় তিনি তাঁহার গ্রন্থ মধ্যে নিজ জীবনের গুণ দোষ সকলই অকপটে চিত্রিত করিয়া গিয়াছেন। ইহা হৃদয়ের সুমহতী প্রসারতা ব্যতীত কখনও সম্ভবপর নহে।

অমরেন্দ্রনাথ মাত্র একখানি পঞ্চাঙ্ক নাটক বিরচিত করিয়াছিলেন। নাটকখানির নাম হরিরাজ। নাটকীয় চরিত্রগুলি সেক্‌সপীয়র হইতে পরিগৃহীত হইলেও বাঙ্গালায় তাহারা সম্পূর্ণ নূতন ও অভিনয়ে সম্পূর্ণ হৃদয়গ্রাহী। ইহা কম ক্ষমতার পরিচায়ক নহে। উহাতে ভাষাবিচার ও চরিত্রানুরূপ বাক্যপ্রয়োগে কোথায়ও অকুশলতা পরিলক্ষিত হয় না। সঙ্গীত প্রণয়নেও কিশোর নাট্যকারের বিশেষ প্রবীণতা পদে পদে বিদ্যমান। সেক্‌স্‌পীয়রের দুইখানি নাটক হইতে গল্পাংশ গৃহীত হইলেও আখ্যান বস্তুর সমাবেশ বেশ

সুসঙ্গত ও প্রশংসার্হ। দৃশ্য সংযোজনায়ও কোনও ত্রুটি লক্ষিত হয় না। তবে স্থানে স্থানে যাহা কিছু অঙ্গাভাব আছে তাহা গ্রহণীয় নহে। আমরা নাটকখানি পাঠ করিয়া ও উহার অভিনয়ের কথা স্মৃতিপথারূঢ় করিয়া নবীন নাট্যকারকে সাধুবাদ না দিয়া থাকিতে পারি না। বিশেষতঃ তরুণ অমরেন্দ্রনাথের হরিরাজের ভূমিকায় বিচিত্র সর্ব্বাঙ্গসুন্দর অভিনয়ের কথা মনে করিলে তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধায় হৃদয় পরিপূর্ণ হয়।

পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের ভূমিকায় ও ভ্রমরে গোবিন্দলালের ভূমিকায় যুবক অমরেন্দ্রনাথের অভিনয় দর্শনে প্রীত হইয়া কবিচূড়ামণি শ্রীযুক্ত নবীনচন্দ্র সেন তাঁহাকে যে পত্রখানি লিখিয়াছিলেন তাহা পাঠে অমরেন্দ্রনাথের অভিনয় যে প্রথম হইতেই স্বভাবসিদ্ধ অপূর্ব্ব অভিনয় কুশলতায় পরিপূর্ণ ছিল তাহার জাজ্বল্যমান পরিচয় পাইয়া আমরা বিস্ময়ে অবাক্ হইয়া যাই। নবীনচন্দ্র লিখিয়াছিলেন—

ভাই অমর,

পূজ্যপাদ বঙ্কিমচন্দ্রের কৃষ্ণকান্তের উইল পরিবর্ত্তিত করিয়া গত শনিবার 'ভ্রমর' নাম দিয়া যে অভিনয় করিয়াছ তাহা দেখিয়া যারপর নাই পরিতৃপ্ত হইয়াছি। মনে পড়ে কি সেইদিন—যেদিন প্রথম তোমাকে বঙ্গ রঙ্গমঞ্চে সিরাজের অংশ লইয়া অবতীর্ণ হইতে দেখি? সেই দিন তোমাকে বলিয়াছিলাম যে নাট্যজগতে একদিন তোমার বহু উচ্চে স্থান হইবে, তুমি বঙ্গবাসীর পরম আদরের

সামগ্রী হইবে। তখন আমার কথা শুনিয়া তুমি হাসিয়াছিলে, কিন্তু এখন আমার সে সময়ের গণনা সত্য হইয়াছে কি না?

A nation is known by its Theatre—কথাটি বড়ই ঠিক। আমাদের যেমন দেশ, থিয়েটারের প্রতি লোকের শ্রদ্ধাও তদ্রূপ। তোমার অবিদিত নাই অনেক গণ্যমান্য ব্যক্তি, যাঁহারা বিদ্বান্ বলিয়া অভিমান রাখেন, তাঁহারা থিয়েটারের নাম শুনিলে নাসিকা কুঞ্চিত করেন। কিন্তু সত্য বলিতে কি তাঁহারা যত বড় লোক হউন না কেন, আমি তাঁহাদের প্রশংসা করিতে পারি না। তুমি সুখী হও, তুমি যশস্বী হও, রঙ্গভূমির প্রতি তোমার ভালবাসা অক্ষয় অমর হউক।”

বস্তুতঃ কবি প্রফেটের ন্যায় সর্ব্বজ্ঞ ও ভবিষ্যদ্-বেত্তা। কবিবর নবীনচন্দ্রের কথাগুলি তৎকালে তাদৃশ শ্রদ্ধার্হ না হইলেও এখন সকলেই উহার অর্থ সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতেছেন।

সংস্কারক বহু আয়াসেও যে সব সামাজিক বা নৈতিক সংস্কার লোকহৃদয়ে অঙ্কিত করিতে পারেন না, কাব্যকার ও উপন্যাসকার অনায়াসে তাহা করিয়া থাকেন, আবার শ্রব্যকাব্যকার ও উপন্যাসকার স্ব স্ব গ্রন্থ-প্রচারে বহু বৎসরান্তেও যে সব কুসংস্কার দূরীভূত করিতে সমর্থ হয়েন না, দৃশ্যকাব্যকার এক দিনের অভিনয়ে তাহা বিদূরিত করিতে সমর্থ। বহু চেষ্টা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর মহাশয় যে বহুবিবাহ-প্রথা এ দেশ হইতে দূরীভূত

করিতে সমর্থ হয়েন নাই, বঙ্কিমচন্দ্র ও হেমচন্দ্র অনায়াসে সেই পাপ-সংস্কার দেশ হইতে একরূপ উঠাইয়া দিয়াছেন। আবার বঙ্কিম ও হেমচন্দ্র বহু আয়াসেও যে স্বদেশানুরাগ নিদ্রিত বঙ্গে জাগাইতে পারেন নাই, বঙ্কিমের আনন্দমঠের অভিনয়ে এবং দ্বিজেন্দ্রলালের ও গিরিশচন্দ্রের ঐতিহাসিক নাট্যাভিনয়ে সেই অনুরাগ দেশময় দাবানলের ন্যায় উৎসরিত ও প্রকটিত হইয়াছে। গিরিশচন্দ্রই নাট্যাভিনয়ে নিরীশ্বর বঙ্গকে ভক্তির উচ্ছ্বাসে ভাসাইয়াছিলেন। আবার অমরেন্দ্রনাথ তাঁহার পঞ্চরং ও নাট্যরঙ্গ গুলিতে লোকের চোখের ঠুলি খুলিয়া মানবচরিত্রের নারকীয় লীলাগুলি সুস্পষ্ট দেখাইয়া দিয়া সমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাই জ্ঞাতসারে হউক বা অজ্ঞাতসারে হউক সহৃদয় সাহিত্যসেবিগণ তাঁহার অভিনয়ের তাদৃশ পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। অমরেন্দ্রনাথের নাট্যাভিনয়ে লোকে ঠিক নিজের ভিতরের পুণ্য ও পাপগুলি চাক্ষুষ দেখিতে পাইত বলিয়াই তাঁহার সময় হইতে থিয়েটারে অভিনয়-দর্শকের সংখ্যা আশাতীত হইয়াছিল। বস্তুতঃ অন্যান্য নাট্যকার ও অভিনেতৃগণ অনেক সময়ে ভয়ে ভয়ে সমাজচিত্রের বিশ্লেষণ করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু অমরেন্দ্রনাথ যাহা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিতেন তাহা কি স্বীয় গ্রন্থে, কি স্বীয় অভিনয়ে কখনও অবিকল বিশ্লেষণ করিতে পশ্চাৎপদ হইতেন না। তাই তাঁহার রঙ্গনাট্য ও পঞ্চরং এবং উপন্যাসগুলি ভাষা-সম্পদে, চরিত্র-বৈচিত্রে, গ্রথন-পারিপাট্যে

অতি উচ্চ অঙ্গের না হইলেও, অকপট সত্য বিবৃতিতে, দোষগুণের অবিকল-চিত্র-সংগঠনে ও ভাববিকাশে তাহাকে সর্ব্বাগ্রণী করিয়া রাখিয়াছে। অপর নাট্যকারের চরিত্রাভিনয়েও অমরেন্দ্রনাথ এমন একটি বাস্তব জীবন্ত ছবি ফুটাইয়া তুলিতেন যে তাহা একরূপ অদ্ভুত, অনন্যসাধারণ, অননুকরণীয়,—তাঁহারই নিজস্ব। উহাই তাঁহাকে নাট্যামোদিমাত্রের নিকটে চির আদরণীয় করিয়া রাখিয়াছিল। বস্তুতঃ তাঁহার অভিনয়ে অভিনেতার শিক্ষিত পাটব ছিল না, স্বভাবের নগ্ন অকৃত্রিম শোভা সর্ব্বত্র বিরাজিত। যেমন আকৃতি, তেমনই কণ্ঠস্বর—তেমনই সাত্ত্বিকতা—অভিনেতৃরূপেই বিধাতা তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন। অপরাপর অভিনেতার চরিত্রানুরূপ সাজ, পোষাক, মেক-আপ প্রভৃতি বিস্তর সাজসরঞ্জামের আবশ্যক হইত, অমরেন্দ্রনাথের নিসর্গদত্ত রমণীয় আকৃতি ও সুমধুর কণ্ঠস্বরের গুণে তাঁহার আহার্য্য শোভার কিছুই দরকার হইত না। তাই তিনি যে ভাবে যে চরিত্রে যখনই আভির্ভূত হইতেন, তখনই তাঁহাকে তাহাতে বেশ মানাইত। এমন কি ভূপেন্দ্র বাবুর 'Sign of the Cross' নাটকে বিদেশীয় নাট্যসাহিত্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ অমরেন্দ্র-নাথের মার্কাসের ভূমিকায় অবতরণে তাঁহার চেহারা ও অভিনয় দেখিয়া বিদেশীয় সুসম্ভ্রান্ত সাহেবেরা পর্য্যন্ত আনন্দে মুক্তকণ্ঠে বলিয়া উঠিয়া-ছিলেন—"Mr. Dutt, you are Garic of all nations." *

* শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রবাবু তাঁহার 'Sign of the Cross' নাটকের

নাট্যকার, রঙ্গনাট্যকার, ও গীতিনাট্যকার এদেশে অমরেন্দ্রনাথের পূর্ব্বে অনেক ছিলেন। কিন্তু তাঁহার নাটক, গীতিনাট্য ও রঙ্গ-নাট্যগুলি এক স্বতন্ত্র শ্রেণীর। পূর্ব্ববর্ত্তী কিংবা পরবর্ত্তী কোনও গ্রন্থকারের গ্রন্থের সহিত অমরেন্দ্রনাথের গ্রন্থের কোনরূপ সাদৃশ্য লক্ষিত হইবে না। ইহাই ইহাদের বিশেষত্ব। অমরেন্দ্রনাথ উচ্চ সাহিত্য লক্ষ্য করিয়া কিছুই রচনা করেন নাই, তাঁহার গ্রন্থগুলি তাৎকালীক দর্শক ও তাঁহার পরিচিত গণ্ডীর মধ্যের লোকগুলির চরিত্রের অবিকল অনুকরণেই বিরচিত। সুতরাং অমরেন্দ্রনাথের স্বীয় জীবনের সুখ ও দুঃখ, লাভ ও লোকসান, বন্ধুত্ব ও নিমকহারামী এবং তাঁহার প্রিয় দর্শকবৃন্দের চিত্তসুখপ্রদ বিষয় তাঁহার প্রধান প্রতিপাদ্য এবং সেগুলি তিনি অকপটে বক্ষঃ-শোণিতে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া তখন উহারা সকলের অত্যন্ত হৃদ্য ও আদরের হইয়াছিল। অমরেন্দ্র-নাট্যে তাঁহার নিজের পরিবেশের অন্তর্গত এক একটী লোকের জীবন্ত চিত্রের অভিনয় দেখিতে দেখিতে সকলেই মূলের সঙ্গে

ভূমিকায় লিখিয়াছেন—"স্বয়ং মার্কাসের ভূমিকা অভিনয় করিয়া এরূপ একটা নূতন ছবি দেখাইলেন যে বঙ্গদেশে কোনও অভিনেতা অথবা কোনও দর্শক তাহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। কতকগুলি সম্ভ্রান্ত ইংরাজ দর্শক মহোদয় সেদিন মার্কাসের অভিনয় দেখিয়া মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গলেন—Mr. Dutt, you are Garic of all nations'.

সাক্ষাৎ তুলনা করিয়া মুগ্ধ হইয়া যাইতেন, কেন না অমরেন্দ্রনাথের নিজের জীবনীও যে সম্পূর্ণ নাট্যলীলাময়।

অমরেন্দ্রনাথের জীবনের লক্ষ্য অভিনয়। উহা তাঁহার বাল্যের আদর্শ, কৈশোরের স্বপ্ন এবং প্রথম যৌবনের জাগরণ। এই স্বপ্নে বিভোর হইয়া কৈশোর ও যৌবন সন্ধিতে তাঁহাকে পতঙ্গ-বৃত্তি অনুসরণ করিতে হইয়াছে, কিন্তু তাঁহার লক্ষ্য অতি মহত্ বলিয়া পতঙ্গের পরিণাম তাঁহাকে একেবারে প্রাপ্ত হইতে হয় নাই,—উত্তালতরঙ্গ-সঙ্কুল সাগরগর্ভে বাতবিক্ষুব্ধ কাণ্ডারীহীন তরণীর ন্যায় পদে পদে জীবনমরণের সন্ধিস্থলে উপস্থিত হইলেও, একেবারে মধ্য দরিয়ায় ডুবিতে হয় নাই। সাধনাবলে কাণ্ডারীহীন হইয়াও তরণী অবশেষে চির আকাঙ্ক্ষিত সুবর্ণ-সফলতার তীরে উপনীত হইতে পারিয়াছিল। পিতৃগৃহ প্রাপ্ত বিপুল ধনরাশি থিয়েটারে তিনি ব্যয়িত করেন নাই, উহা থিয়েটারে প্রবেশের পূর্ব্বেই কুসঙ্গীর কুচক্রে মাঝ দরিয়ায় বিসর্জ্জিত হইয়াছিল। তিনি বিনা কপর্দ্দকে থিয়েটারে প্রবিষ্ট হইয়া কেবল স্বীয় প্রতিভাবলে ও সাধনাপ্রাবল্যে অশেষ সুখ্যাতির সহিত বিপুল অর্থ উপার্জ্জন করিয়াছিলেন, আবার অর্থনীতির জ্ঞানাভাবে সমুদায়ই খুয়াইয়াছিলেন। অর্থনাশে তাঁহার বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, কিন্তু স্বাস্থ্যনাশেই সর্ব্বনাশ হইল। শেষে সাধনায় সিদ্ধ হইয়া যখন চারিদিকে দৃষ্টি পড়িল তখন প্রতিভার নিকটে কিছুই অবিদিত রহিল না। বঞ্চকের বঞ্চকতা, চাটুকারের মিশ্রির ছুরিকা, সকলই

বুঝিতে পারিলেন। কিন্তু তখন আর উপায় ছিল না, দেহ অবসন্ন—মন পীড়িত। পরিশেষে পতিব্রতা সতীর শুশ্রূষায় ও স্বর্গীয় প্রেম-মাহাত্ম্যে মৃত্যুমুখ হইতে প্রত্যাগত হইয়া আবার সোণার সংসার পাতাইলেন বটে, কিন্তু তাহা তাঁহার সহিল না, কেননা সাধ্বী যে স্বীয় জীবন বিনিময়ে পতির প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন, তাই তিনি আরাধ্য দেবতাকে স্বমন্দিরে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহার ক্রোড়ে বংশপ্রতিষ্ঠা সত্যেন্দ্রনাথকে সাদরে অর্পণ করিয়া পতিপদে চিরবিদায় গ্রহণপূর্ব্বক চিরেপ্সিত পতিব্রতালোকে গমন করিয়া অর্দ্ধাঙ্গের প্রতীক্ষায় তথায় ইষ্টদেবতার আরাধনা করিতে লাগিলেন। হেথায় লক্ষ্মীশূন্য নারায়ণ আর কতদিন থাকিতে পারেন! তিন বৎসর যাইতে না যাইতে অভিনেতৃরত্ন সংসারের বন্ধন ছিন্ন করিয়া পতিব্রতাপার্শ্বে দিব্যলোকে গমন করিলেন।*

অমরেন্দ্রনাথ স্বধামে চলিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তিতে কেহ দুঃখিত নহে, কেননা সকলকেই তথায় যাইতে হয়। কিন্তু চিরপ্রার্থিত বাসন্তী পূর্ণিমার রজনী হইতে না হইতে প্রভাত উপস্থিত হইলে কাহার না প্রাণ কাঁদিয়া উঠে? প্রতিভার বিকাশ হইতে না হইতেই যদি লুপ্ত হইয়া যায় তাহাতে কাহার প্রাণ না

---

* শ্রীমতী হেমনলিনী ১৩২০ সালের ৩০শে বৈশাখ পরলোকে গমন করেন। শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ দত্ত ১৩২২ সালের ২১শে পৌষ মানবলীলা সংবরণ করেন।

হাহাকার করে? যে বয়সে গিরিশচন্দ্র ও দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্য-প্রতিভার বিকাশ সবে উন্মেষিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে, সেই বয়সে পঁহুছিতে না পঁহুছিতেই অমরেন্দ্রনাথের ভবলীলা শেষ হইল! ইহা কি বঙ্গবাসীর কম আক্ষেপের বিষয়, কম ক্ষোভের কারণ! বাঙ্গালার এই দুর্ভাগ্য চিরদিনই অটুটভাবে বিদ্যমান। কবিবর জয়দেব ও চণ্ডীদাস হইতে পণ্ডিতকুলতিলক রামকমল পর্য্যন্ত কত শত 'বঙ্গবাণীবিনোদ-নিকুঞ্জের কোকিল কুল' বসন্তের প্রারম্ভেই চলিয়া গিয়াছেন! মহিলাকাব্যের সুরেন্দ্রনাথ, যোগেশকাব্যের ঈশানচন্দ্র, আরও কত কত বঙ্গ কাব্য-সরোবরের শতদল বিকসিত হইতে না হইতেই শুকাইয়া গিয়াছে! বঙ্গমাতার প্রতি ভাগ্যদেবতা বড়ই অপ্রসন্ন!

অমরেন্দ্রনাথের জীবনের লক্ষ্য-সম্পূর্ণ সফলতা লাভের পূর্ব্বেই তাঁহার পরলোকপ্রাপ্তিতে আমরা নিতান্ত দুঃখিত হইলেও, বঙ্গ-রঙ্গালয়ে তাঁহার অপ্রতিহত সুসমুন্নত স্থান দর্শনে পরম পুলকিত। যদ্যপি তিনি সাধারণ নাট্যশালার আদি প্রতিষ্ঠাতাদের অন্যতমরূপে গৃহীত হইবার অধিকারী নহেন, তথাপি রঙ্গালয় যে সর্ব্বশ্রেণীর লোকের আদরের সামগ্রী ও নাট্যাভিনয় দর্শনে মৃত সমাজ পুনরুজ্জীবিত হয় এবং সুপ্ত মনুষ্যত্ব জাগরিত হয় তাহা তিনিই বঙ্গবাসীর নেত্র-সমক্ষে প্রথমে উদ্ভাসিত করিয়াছেন। সমাজের অন্তর্নিহিত বিষম পাপগুলি অমৃতলাল ও অমরেন্দ্রনাথ, ইহারা দুই জনেই আমাদিগকে

জ্বলন্ত অক্ষরে জীবন্ত চিত্রে দেখাইয়া দিয়াছেন। অমৃতলালের চিত্রগুলি সাহিত্য-হিসাবে অদ্বিতীয়। অমরেন্দ্রনাথের চিত্রগুলি নগ্ন স্বভাবসৌন্দর্য্যে অননুকরণীয়। অমরেন্দ্রনাথ সাহিত্যের দিক্ দিয়া আদৌ কোন চরিত্রাঙ্কনে অগ্রসর হন নাই, সে বিদ্যা তাঁহার ছিল কি না আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু তিনি যে দিক্ দিয়া অগ্রসর হইয়াছিলেন তাহাতে তিনি অদ্বিতীয়। তাজ্জব-ব্যাপার ও বিবাহ-বিভ্রাট বিংশশতাব্দীর রঙ্গনাট্য-সাহিত্যকোহিনুর, কাজের খতম, চাবুক ও ঘুঘু বাহ্য সভ্য কিন্তু অন্তর্ঘুঘু অর্থাৎ 'পয়োমুখ বিষকুম্ভ' লোকদের মুকুর-প্রতিফলিত অবিকল প্রতিবিম্ব। তাঁহার 'দুটী প্রাণ' গীতিনাট্য ভারতবন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের নাটকাকারে পরিবর্ত্তন হইলেও, উহাতে বিদ্যা ও সুন্দরের চরিত্রে দর্পণে প্রতিফলিত জীবন্ত ছবি প্রতিফলিত হইয়াছে। উহা মহারাজা স্যার যতীন্দ্রমোহনের 'কৌতুক সর্ব্বস্বের' জীবনহীন চিত্র নহে। অমরেন্দ্রের গ্রন্থাবলীতে প্রদত্ত নৃত্য ও সঙ্গীত-বহুলতা তাঁহার নিজের দোষ নহে, উহা তখনকার দর্শকবৃন্দের রুচির পরিচায়ক মাত্র। তরুণ যুবক যে দিকে লোকের প্রবৃত্তির গতি বুঝিতে পারিতেন, সেই দিকেই তিনি গতি ফিরাইতেন। তাই পূর্ব্বে বলিয়াছি যে সুচালকের হস্তে পড়িলে অমরেন্দ্র-প্রতিভার শুদ্ধ বাঙ্গালায় কেন, সমগ্র ভারতে, অপূর্ব্ব দিব্য বিভা উচ্ছ্বসিত হইত। অমরেন্দ্রনাথের 'দলিতা-ফনিনী' ও 'প্রণয় না বিষ' এই দুইখানি নাটিকার উপাখ্যান ভাগ সুবিখ্যাত ঔপন্যাসিক

শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের দুইখানি উপন্যাস হইতে সঙ্কলিত হইলেও উহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই নাট্যকারের মৌলিক নিজস্বের একটুও অভাব নাই। অমরেন্দ্রনাথ নিজেও যেমন অতিরিক্ত ভাবপ্রবণ ছিলেন, তদঙ্কিত চরিত্র মধ্যেও ভাবের বিহ্বলতা পূর্ণমাত্রায় পরিস্ফুট। সেই ভাবাধিক্যই তাঁহার রচিত চরিত্রগুলিকে এক সোণার স্বপনে ঘিরিয়া রাখিয়া দর্শক ও পাঠকবৃন্দের চিত্তকন্দর সর্ব্বদা এক বিচিত্র অভিনব আবেশে বিহ্বল করিয়া রাখিত। উহাই তাঁহার চরিত্রাঙ্কনের বিশেষত্ব—উহাই তাঁহার অদ্ভুত উন্মাদনা-বিকাশ-ক্ষমতা।

রঙ্গালয় সম্বন্ধে অমরেন্দ্রনাথের আর একটী সংস্কার অভিনেতা ও অভিনেত্রী সমাজে তাঁহাকে চিরদিন অক্ষয় ও অমর করিয়া রাখিবে। তিনিই প্রথমে অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের বোনাস্ ও বেনিফিট প্রদানের রীতি প্রবর্ত্তিত করেন। তাঁহারই প্রসাদে অদ্যাবধি অনেক ভদ্রসন্তান বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চশিক্ষা লাভ না করিয়াও শুদ্ধ অভিনয়প্রতিভার বিকাশে পুত্রপরিজনসহ শান্তিতে বিনাড়ম্বরে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইতেছেন। *

---

* নায়ক পত্রের সম্পাদক সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯১৯ খৃষ্টাব্দের ১লা জানুয়ারী অমরেন্দ্রনাথের স্মৃতি সভায় বলিয়াছিলেন—"তিনি থিয়েটারের অভিনেতা ও অভিনেত্রীগণের বেতন বাড়াইয়া দিয়া গিয়াছেন। তাঁহারই প্রসাদে আজ বহু দুঃস্থ ভদ্র সন্তান ও অন্যান্যেরা

অভিনেতার জীবন যে হেয় ও নিন্দিত নহে, ইহা যে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের অন্যান্য উপায়ের ন্যায় একটী ভদ্রোচিত ব্যবসায় তাহা অমরেন্দ্রনাথই প্রথমে বঙ্গরঙ্গমঞ্চে দেখাইয়াছেন। অভিনেতার বেতন বৃদ্ধি বিষয়ে অমরেন্দ্রনাথই প্রথম প্রবর্ত্তক। যেমন স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে কত শত শত লোকের বিবিধ কর্ম্মদ্বার খুলিয়া যাওয়ায় দেশের অনেক অভাব দূরীভূত হইয়াছে, সেইরূপ অমরেন্দ্রনাথ প্রবর্ত্তিত দীর্ঘকালব্যাপী অভিনয় ব্যাপারে প্রায় প্রতি রঙ্গালয়ে চতুর্গুণ লোকের আবশ্যক হওয়ায়, অনেক অশিক্ষিত অথচ অভিনয়-প্রতিভান্বিত ভদ্র সন্তানের অন্নের পথ পরিষ্কৃত হইয়াছে। অন্যান্য আফিসের ন্যায় থিয়েটারে চাকুরীও এখন আর সকলের অসম্মানের নহে। বস্তুতঃ যাঁহাদের প্রতিভা অব্যবহারে বা অপব্যবহারে কেবল নষ্ট হইয়া যাইত, তাঁহারা প্রতিভানুরূপ কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশলাভ করিয়া ক্রমশঃ লোকসমাজে প্রতিভার বিকাশে বরণীয় হইয়া উঠিতেছেন। তাই আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, অমরেন্দ্রনাথ থিয়েটার কখনও কাপ্তানের লীলা-ভূমি মনে করিতেন না, তাঁহার কুসঙ্গিগণ সর্ব্বদা তাঁহাদ্বারা সেইরূপ ব্যবহার করাইলেও, তিনি সর্ব্বদা থিয়েটার মন্দিরকে বাণীর বিনোদ-নিকুঞ্জ, ললিতকলার

সম্মানের সহিত স্বীয় জীবিকা উপার্জ্জন করিতেছেন। তিনি যদি এই সকল কার্য্য না করিতেন তো বহু ব্যক্তি তাঁহাদের পরিবারের এবং নিজের ভরণ পোষণ করিতে সক্ষম হইতেন কিনা সন্দেহ।”

শিক্ষানিকেতন বলিয়া মনে করিতেন ও তদনুরূপ শ্রদ্ধা ও ভক্তি প্রদর্শন করিতেন এবং পূতজ্ঞানে তথায় জীবনের সাধনা সম্পাদিত করিতেন।

গিরিশচন্দ্র, অর্দ্ধেন্দুশেখর ও অমৃতলাল বাণীর মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া সর্ব্বসাধারণ্যে তাঁহার পূজার প্রচার করেন। অমরেন্দ্রনাথ গুরুপদে শিক্ষিত না হইয়াও স্বীয় জন্মাবচ্ছিন্ন সংস্কারবশতঃ একলব্যের ন্যায় অনন্যপরায়ণ সাধনা বলে সেই মন্দিরের প্রধান পুরোহিত হইয়া গিয়াছেন। তাঁহার নৈসর্গিক প্রতিভা প্রাণপণ সাধনায় পরিস্ফুট হইয়া তাঁহাকে সর্ব্ববিষয়ে অনন্যসাধারণ করিয়া তুলিয়াছিল। সংক্ষেপে তিনি বিনা শিক্ষায়—নাট্যকার ও উপন্যাসকার, এবং প্রথম শ্রেণীর অভিনেতা ও রঙ্গালয়পরিচালক। বস্তুতঃ প্রতিভা যে শিক্ষার সহযোগ বিনাও স্বক্ষেত্রে সময়ে বিকশিত হইতে পারে তাহাই অমরেন্দ্র-জীবনের প্রথম জ্বলন্ত নিদর্শন। প্রকৃত নেতার অভাবে প্রতিভার কিরূপ অপগতি হয়, তাহাই তাঁহার জীবনের দ্বিতীয় উপদেশ। সর্ব্বোপরি ভস্মাচ্ছাদিত হইলেও বহ্নি যে পরিশেষে জ্বলিয়া উঠিবেই—অমরেন্দ্রনাথের অনন্যসাধারণ দয়া ও দক্ষিণতাই বঙ্গবাসীর প্রতি তাঁহার জীবনের চরম শিক্ষা।

যাও অমরেন্দ্রনাথ, যাও অমরধামে। কৈশোরে কুসঙ্গীর কুপ্রলোভনে মার্গচ্যুত হইয়া সংসারের অশেষ যন্ত্রণা-পারাবারের মধ্যে তোমাকে অশেষবিধ অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করিতে হইয়াছে। কিন্তু এক্ষণে সাধ্বী

অমরেন্দ্র প্রতিভা

পতিপ্রাণা পত্নীর দক্ষিণে সতীলোকে উপবিষ্ট হইয়া সম্মুখে অবিরত তোমার চিরারাধ্য নাট্যকলার অধিষ্ঠাতৃদেবতা উমামহেশ্বরের যুগল মূর্ত্তি দর্শন করিতে করিতে অহর্নিশ নাট্যলীলা প্রত্যক্ষ করিবে! এ রাজ্যে বন্ধুর কৃতঘ্নতা নাই, পিশাচীর ছলনা নাই, অর্থের অসচ্ছলতা জন্য মানসিক অশান্তি নাই—আত্মীয় স্বজনের ভ্রান্তি বশতঃ তিরস্কার গঞ্জনা নাই, প্রাণাধিকা প্রিয়তমার বিচ্ছেদ যাতনা নাই—আছে শুধু সুখ—শান্তি—বিশ্রাম—শ্রদ্ধা—সাধনা ও সিদ্ধি!!! এই পবিত্র নিত্যানন্দধাম তুমি তোমার আজীবন সাধনায় ও পতিপ্রাণা সাধ্বীর দিব্য প্রাণান্তকর প্রণয়ে লাভ করিয়াছ! সাংসারিক যন্ত্রণাগুলি কেবল ভ্রান্তমার্গ পথিকের ন্যায় তোমার ভুগিতে হইয়াছে,—পাঞ্চভৌতিক দেহত্যাগের সঙ্গেই সমুদায় পঙ্কিলতা চিরতরে বিদূরিত হইয়াছে।

সম্পূর্ণ।